দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

সেকুলার রাজনীতির নোংরা খেলায় হিন্দু ওবিসি সংরক্ষণ গুমরে কাঁদে — পৃঃ ১৩

পশ্চিমবঙ্গের গরিব, অনগ্রসর হিন্দু সমাজের উপর হওয়া অবিচার বন্ধ করার সময় এসেছে — পৃঃ ২৩

৭৭ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ২৮ জুলাই, ২০২৫।। ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৮ জুলাই - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘মুসলমানদের মসিহা মমতা ব্যানার্জি’ প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী মাপার মতো নেইতো ফিতে ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

শিঙাড়া বুলবুলি মস্তক ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

তিব্বতের পবিত্র পরম্পরার উপর ড্রাগনের হানা ◻ ড. প্রশান্ত ত্রিবেদী ◻ ৮

অবিলম্বে তিন কোটি হিন্দু বাঙ্গালিকে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিকারে ভারতের হস্তক্ষেপ জরুরি ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ১১

সেকুলার রাজনীতির নোংরা খেলায় হিন্দু ওবিসি সংরক্ষণ গুমরে কাঁদে ◻ সিদ্ধানন্দ পুরকাইত ◻ ১৩

‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে’ ◻ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫

মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত : ড. ইউনুস প্রভুদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে মহাব্যস্ত ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের গরিব, অনগ্রসর হিন্দু সমাজের উপর হওয়া অবিচার বন্ধ করার সময় এসেছে ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ২৩

হারানো পত্রিকা—অর্চ্চনা পত্রিকার নামেই ডাকঘর ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

বৈদিক সনাতন হিন্দুধর্মে ঋষিকা পরম্পরা ◻ বন্দনা বিশ্বাস ◻ ৩৪

মোদীজীর নেতৃত্বেই প্রযুক্তি দক্ষতা ও সংকল্পে দেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৩

২০২৬-২৭-এর যোড়শ জনগণনা হতে চলেছে ভারতের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা ◻ অর্ণব কুমার দে ◻ ৪৩

হিন্দু সন্ন্যাসী সেজে ধর্মান্তরণের কারবার—মোটা টাকার টোপ দিয়ে হিন্দু মহিলা ধরত জামালউদ্দিন ◻ প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ◻ ৪৫

বাঙ্গালি আবেগের আড়ালে অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও আন্দোলন ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **খেলা : ৩৮** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮**

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ আগস্ট
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৪ আগস্ট
২০২৫

‘বাঙ্গালি আবেগ’ নিয়ে রাজনীতি

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং দেশজুড়ে অনুপ্রবেশকারীদের ধরপাকড় ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান সম্প্রদায় হলো তাঁর বিশ্বস্ত ভোটব্যাংক। তাদের বাঁচাতে তিনি ঢাল করছেন ‘বাঙ্গালি আবেগ’কে। দেশজুড়ে বাঙ্গালি আক্রান্ত বলে তিনি একটি সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইছেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাই তিনি তাদেরও ভারতের ভোটার তালিকায় রাখতে চাইছেন। আর এটা সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে তাই বাঙ্গালি আবেগ তুলে ধরে তিনি রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। বিরোধিতা করছেন ভোটার তালিকা সংশোধনের।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সুগভীর চক্রান্ত

বৈদেশিক আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষে শাসন কায়েম করিয়াছিল ছলে-বলে-কৌশলে। আরব মরুদস্যুরা সম্মুখ সমরে না পারিয়া লোভ প্রদর্শন ও ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল। চতুর ইংরাজরা তো নীতিই গ্রহণ করিয়াছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি প্রণয়ন করেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করিয়া এই দেশে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি মজবুত করা। এই নীতির মাধ্যমে তাহারা ভারতবাসীকে সংখ্যালঘু, বর্ণহিন্দু এবং অনগ্রসর হিন্দু — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ইহারই পরিণামে কালক্রমে ধর্ম-ভাষা, সম্প্রদায় ও জাতপাতে দীর্ণ হইয়া পড়ে ভারত এবং দেশ বিভাজনের পথ প্রশস্ত হয়। বস্তুত, বলা যাইতে পারে, ভারতে জাতিগত সংরক্ষণের বীজ ঔপনিবেশিক কালেই প্রোথিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতেও কেন্দ্র সরকার এমনকী রাজ্য সরকারগুলিও এই বিভেদনীতির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় সমাজের বঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া দরিদ্র মানুষদিগের জন্যই সংবিধানে সাময়িককালের নিমিত্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া বর্ণের ভিত্তিতে করিয়াছিলেন। ধর্মানুযায়ী সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন না গণপরিষদের সদস্যরাও। তাহা সত্ত্বেও কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের ন্যায় কয়েকটি রাজ্য ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ প্রয়োগ করিয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে সৈয়দ আহমদ খানের ন্যায় নেতাও এই ধরনের সংরক্ষণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংবিধান প্রণেতাগণ আশা করিয়াছিলেন, সামাজিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষদিগের উত্থান ঘটিলেই আপনা হইতেই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সমাপ্ত হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় হইল, ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থাটিকে দীর্ঘমেয়াদি রূপ প্রদান করিয়াছে। তাহার কারণেই ভারতীয় সমাজে স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও সংহতি প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বরং জাতপাতে দীর্ণ হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিতে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের প্রবক্তা বামফ্রন্ট সরকার। তাহারাই এই রাজ্যে মুসলমানদের ওবিসি শ্রেণীভুক্ত করিয়া সংরক্ষণের আওতায় আনিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি হিসাবে শুধুমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখদিগেরই কথা বলা হইয়াছে। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ইহার আওতায় ফেলা হয় নাই। কারণ ওই দুইটি আব্রাহামিক মজহব ও রিলিজিয়নে বর্ণব্যবস্থা অনুপস্থিত। তাহা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভোটপ্রাপ্তির আশায় বামেরা তাহাদের ওবিসি তালিকাভুক্ত করিয়াছে। এই গর্হিত কর্মটি করিয়া বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা হইতে তাহারা দরিদ্র হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে আদালতে জনস্বার্থ মামলা পর্যন্ত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, ২০১১ সালে তৃণমূল দল সরকারে আসিয়া বামফ্রন্ট সরকারের অসাংবিধানিক সংরক্ষণকে আইনি বৈধতা প্রদান করে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তো প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন যে তিনি মুসলমান তোষণ করেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁহার দুধেলগাই হিসাবেই সম্বোধন করিয়াছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তৃণমূল সরকারের নূতন ওবিসি তালিকায় সংযোজিত ৮৬ শতাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, ইহাতে যে ৭৬টি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৬৭টিই মুসলমান সম্প্রদায়ের। এই নূতন ৭৬টি শ্রেণীকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এ-ভাগে ৫১টি শ্রেণী। ইহার মধ্যে ৪৬টিই মুসলমান সম্প্রদায়। বি-ভাগে ২৫টি শ্রেণী। ইহার মধ্যে ২১টি মুসলমান সম্প্রদায়। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে, সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিয়া কলকাতা উচ্চ আদালত গত বৎসর ২০১০ সালের পর বিতরণ করা প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যাহার অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ রাজ্য সরকারের এই সুগভীর চক্রান্তটি অনুধাবন করিতে না পারিলে, তাহাদিগের কপালে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না।

সুভাষিতম্

নরস্যাভরণং রূপং রূপস্যাভরণং গুণঃ।
গুণস্যাভরণং জ্ঞানং জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা।।

মানুষের অলংকার হলো রূপ, রূপের অলংকার হলো গুণ, গুণের অলংকার হলো জ্ঞান এবং জ্ঞানের অলংকার হলো ক্ষমা।

‘মুসলমানদের মসিহা মমতা ব্যানার্জি’ প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী

মাপার মতো নেইতো ফিতে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ‘হিন্দুবিরোধী’ না ‘হিন্দুবিদ্বেষী’? আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এক মনে হতে পারে। একজন নামজাদা ঐতিহাসিক তাঁর একটি গ্রন্থে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির সংঘাত আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার টেনে দেখিয়েছেন কীভাবে তা খানিকটা আলাদা। এপার ও ওপার বঙ্গে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের অসংখ্য উদাহরণ টেনে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উপাসনা পদ্ধতিগত সংঘাত হয়। সেই উপাসনা পদ্ধতির অনুগামীদের বিশ্বাস ও উন্মাদনাকে ঘিরে আর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। প্রথমটি উত্তর আধুনিক যুগের ব্যাখ্যা এবং পরেরটি আরও পরের আধুনিকতার উদাহরণ।

ভোট পাবেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান তোষণ করেন। এটা সকলের জানা। অন্যরা প্রকাশ্যে না মানলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মানেন। মুসলমানদের তিনি ‘দুধেল গাই’ হিসেবে সম্বোধনও করেছেন। দুর্নীতির পাহাড়ে ডুবে থাকা তৃণমূলের বাইরে অনেকেই তাঁকে ‘ঘোটালা দিদি’ বলে ডাকেন। দেশের রাজ্যে রাজ্যে তাঁর বিস্তর বদনাম। দুর্নীতির পাহাড় আর নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ ঘিরে সমালোচনা অগ্রাহ্য করে কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে রাজ্য চালান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনো বিরোধিতাকেই গুরুত্ব দেন না তিনি। করেন না কোনো বিরোধী স্বরে কর্ণপাত। ২০১১-র পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনে সাফল্য পেয়ে তিনি ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের মতো ‘আমিই স্টেট’ হয়ে গিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি যেন প্রমাণ করেন যে, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তিনিই হলেন শেষ কথা। স্বাধীনতার ৭৮ বছরের মধ্যে ৫৩ বছর দেশ চালিয়েছে কংগ্রেস। ফলে ‘ডোন্ট কেয়ার’ ভাব চলে আসে। নিদারুণ অধঃপতনের দরুন বিগত ৩৬ বছরে কংগ্রেস এককভাবে কোনো জাতীয় নির্বাচন জিতে কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেনি। এখন তারা মাত্র তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। ৩৪ বছরের উন্নাসিক সিপিএমকেও রাজ্যের মানুষ উৎখাত করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ঘোটালা হলো ওবিসি তালিকায় মুসলমানদের মাত্রাহীন সংরক্ষণ। তাতে আদালতে তিনি বারবার ভর্ৎসৃত হন। ঝাড়ে-বংশে বিতাড়িত বিদেশি সিপিএমও তাই করেছিল। প্রবলভাবে মুসলমান তোষণের পরেও তাদের লজ্জাজনক বিদায় হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে কানে তুলো গুঁজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের পাশে থাকার বার্তা দিতেই থাকেন। যদিও তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ রাজ্যের হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করেছে এরকম কোনো নজির নেই। বরং সরকারি মদতে এর উল্টোটাই রাজ্যজুড়ে অহরহ ঘটে চলেছে।

১৯৪৭-এ সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গের। তার ৭৮ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে ধুলাগড়, মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদের মতো ঘটনা ঘটছে। শেখ শাজাহানরা আজ তৃণমূলের সম্পদ। তাদের মতো জেহাদি, দুষ্কৃতীদের হাতে হিন্দু নারীদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ঠিক সেই কারণেই এ রাজ্যের মুসলমানরা মূল স্রোতে যুক্ত হয়নি। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঠিকই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ‘রাষ্ট্রবাদী মুসলমান’ হয় না। সেকুলার শাসক তার নিজের সুবিধায় মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে সামাজিক, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে। হিন্দু ও মুসলমান বিভাজনের যে বাস্তবকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রেখে গিয়েছিল, কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিদেশি বাম আর পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দল তৃণমূলও তাতে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে একজন হিন্দু যেমন ভারতের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনই একজন মুসলমানও রাষ্ট্রচেতনার বিরোধী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে তারা একাত্ম হতে পারেনি যা কিনা কাম্য ছিল। এই সেকুলার শাসক দলগুলি মুসলমানদের ভারতীয়করণে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়ায় বিদেশি মাওবাদ আর নকশালি খোকামি ধ্বংস হয়ে যায়। বাম মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্রমিক আন্দোলনও শেষ হয়ে যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন মুসলমানদের জন্য এই বাড়তি সংরক্ষণের নাটক করছেন? তিনি জানেন যে, এই রাজ্যের মুসলমানদের উপর বড়ো কোনো আক্রমণ বা ধাক্কা গত সাত দশকে আসেনি। তবু কেন ‘মুসলমানদের মসিহা’ সাজছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সরাসরি হিন্দু বিরোধিতার একাধিক নজির রেখে মুসলমান মৌলবি আর ইমামদের তিনি বোঝাতে চান যে, মুসলমান স্বার্থরক্ষাই তাঁর প্রধান কাজ। ইমাম-মোয়াজ্জেম ভাতা ঘোষণা, মহরমের কারণে বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি, গরিব ও অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের বঞ্চিত করে মুসলমানদের বেশি মাত্রায় ওবিসি সংরক্ষণ প্রদান, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ‘গন্দা ধর্ম’ শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে তিনি প্রতিনিয়ত তার মরিয়া প্রয়াস জারি রাখেন।

রাজ্য সরকারের তোষণ নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ হলো জেহাদিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই কারণে হিন্দুদের পুরো ভোট বিজেপি পায় না। পেলে রাজনৈতিক চিত্র রাতারাতি পাল্টে যেত। যদিও এখনও এই রাজ্যে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যের ৭৪টি আসনে আনুমানিক এক কোটির ওপর মুসলমান ভোট করায়ত্ত করে আর তার সঙ্গে হিন্দু ভোটের একাংশ যোগ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনায়াসে ভোট জেতেন। দু'কান কাটা বধিরতা তাঁর সহজাত। তাই মাত্রাহীন দুর্নীতি বা নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক তোষণের কোনোরকম বিরোধিতায় ভোলার পাত্রী নন তিনি। বাম- কংগ্রেসের ফেলে যাওয়া সাম্প্রদায়িক উচ্ছিষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে তার পাপের মাত্রা মাপার ফিতে নেই। তবে রাজ্যের মানুষ সে ফিতে তৈরি করছেন কিনা ২০২৬-এর নির্বাচন তার দিকনির্দেশ করবে বলে মনে হয়।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

শিঙাড়া বুলবুলি মস্তক

শিঙাড়াপ্রেমীষু দিদি,

আপনি বলছেন, মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ ঠিক নয়। গোমাংস হোক বা ভাজাভুজি— সত্যিই তো কোনো ক্ষেত্রে একটি উদার গণতন্ত্র মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে, যে খাবার মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, জনস্বাস্থ্যে কুপ্রভাব ফেলছে, তার থেকে ক্রেতাকে দূরে রাখতে কি বলা যায় না? দিদি আপনাকে আমার বিনীত প্রশ্ন।

২০২৩ সালের এক সমীক্ষা জানিয়েছিল, মানুষের খাদ্যাভ্যাস যে হারে অস্বাস্থ্যকর হয়ে চলেছে তাতে ২০৩৫-এর মধ্যেই বিশ্বের অর্ধেক মানুষ স্থূলতায় আক্রান্ত হবেন যা হাড়ক্ষয়, হৃদ্‌রোগ, ক্যানসারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এখন তো ক্যানসারের থেকেও বেশি হাঁটু ব্যথা মহামারীর আকার নিয়েছে। ঘরে ঘরে ওবেসিটির সমস্যা। কিন্তু এই স্বাস্থ্যবিপর্যয় প্রতিরোধ সম্ভব। তার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

দিদি, এই প্রচারকে 'ইনফর্মেশন নাজ' বলা হয়। বিশ্বের অনেক দেশেই এই পথ নিয়ে সুফল মিলেছে। মোবাইলে বার বার বার্তা পাঠিয়ে আমেরিকায় ফল, আনাজ কেনার প্রবণতা বেড়েছে। বেড়েই চলেছে। এ দেশেও আর্থিক জালিয়াতি রুখতে এই পথ নিয়ে লাভ মিলছে। এখন খাবার দাবার নিয়েও এমন পথ তো নিতে হবে। দেশের মানুষকে সুস্থ রাখতেই নিতে হবে। আর সেই পথকে আপনি রাজনৈতিক রং লাগিয়ে বিরোধিতায় নেমে পড়লেন? অবশ্য সেটাই আপনার কাজ, আপনার ধর্ম।

আমাদের দেশে হৃদ্‌রোগ এবং তজ্জনিত অকালমৃত্যু বাড়ছে। চিকিৎসকেরা অনেকাংশেই দায়ী করছেন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনশৈলীকে। মানুষের অভ্যাস পালটানোর একটি প্রয়াস নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তারা কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানাল, শিঙাড়া, কচুরি, বড়াপাও কিংবা জিলিপির মতো ভাজাভুজি মিষ্টির ক্যালরির হিসাব এবং তার বিপজ্জনক দিকগুলি জানিয়ে বোর্ড লাগাতে হবে, জনবহুল জায়গায় এই শারীরিক ঝুঁকির কথা বিজ্ঞাপিত করতে হবে। এমন খাদ্যে তেল, চিনি, চর্বির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। 'অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট বোর্ড'-এ যুক্ত চিকিৎসকের বক্তব্য, এই আহার্যে তরুণ বয়স থেকেই স্থূলতা, মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদ্‌রোগের মতো অসুখ হচ্ছে। তালিকায় আরও রয়েছে লাড্ডু, চিপস, পকোড়া, গুলাবজামুন প্রভৃতি দেশি জলখাবার। কিন্তু আমি যা বুঝলাম তাতে দিদি, আপনি শুধু শিঙাড়া ও জিলিপিটাই পড়েছেন। আসলে এই কারণেই পড়েছেন যাতে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়। ফ্যান্টাস্টিক। না না, আরও বেশি কিছু।

এটা তো সরকারি নিয়ম যে, বাজারজাত ফাস্ট ফুডে পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিতে হয়। এ বিষয়ে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষের (এফএসএসএআই) স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আইনের ফাঁক গলে বেরোতে ব্যবসায়ীরা এগুলি মোড়কে দুর্বোধ্যভাবে ছোটো ছোটো হরফে লিখে দেয়। তাতে দায় এড়ান যায়। লিখলাম কিন্তু কেউ পড়তে পারল না। কিন্তু নিয়ম বলছে, এই স্বীকারোক্তি যাতে মোড়কের উপরে, খোলা বিক্রয়স্থলের সামনে বোর্ডে স্পষ্ট ও সোজাসুজি ভাষায়, দৃষ্টিগোচর ভাবে লেখা হয়।

তবে, শিঙাড়া বা জিলিপির মতো খাবারের ক্ষেত্রে যেহেতু প্যাকেটের বালাই নেই, ফলে তাতে পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্যপ্রকাশেরও সুযোগ নেই। কাজেই, সেগুলির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আরও বেশি জরুরি। কিন্তু দিদি আপনি এবং আপনার দলের লোকজন প্রশ্ন তুলেছেন, শিঙাড়া, জিলিপি কি সিগারেটের মতো ক্ষতিকর যে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ দিতে হবে? সচেতন ব্যক্তিমাত্রের উত্তর, হ্যাঁ। দেশি ও বিদেশি সব রকম ফাস্ট ফুডের ক্ষেত্রেই তা কীভাবে রক্তে শর্করা, ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল বাড়ায়, প্রাণঘাতী রোগকে সুগম করে— বলিষ্ঠভাবে তা লেখা থাকা বিধেয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোনো মতেই পিছু হঠার কথা নয়। কিন্তু তিনি রাজ্যে হতে দেবেন না। রাজ্যের মানুষ যতই অসুখে ভুগুন সেসব করা যাবে না। বরং, এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে বিজেপি বাঙ্গালির প্রিয় খাবারের উপরে ফরমান জারি করছে বলে প্রচার করলে কাজে দেবে।

আমার মনে হয় আপনি ঠিকই করছেন। বাংলা আর বাঙ্গালি ভাবাবেগ যদি আপনাকে বাঁচাতে পারে তবেই মঙ্গল। জয় জিলিপি। জয় শিঙাড়া। জয় বাংলা। □

অতিথি কলম

ড. প্রশান্ত ত্রিবেদী

তিব্বতের পবিত্র পরম্পরার উপর ড্রাগনের হানা

অজ্ঞাত কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তিব্বতকে চীনের ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ বলে উল্লেখ করেন, যদিও তিব্বত কখনোই প্রত্যক্ষ রূপে চীনের অঙ্গ ছিল না।

গত ৬ জুলাই ধর্মশালায় শ্রদ্ধেয় দলাই লামার ৯০তম আবির্ভাব দিবস পালন করা হলো। তাঁর উত্তরাধিকারী বিষয়ে তিনি পরিষ্কার বলেন, পরবর্তী দলাই লামার চয়ন ‘গাডেন ফোডরং ট্রাস্ট’ করবে, অন্য কারও এতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। এই প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক নেতা, নির্বাসিত তিব্বতীয় সরকার এবং অন্য আবশ্যক পক্ষদের যুক্ত করা হবে। এই চয়ন সম্ভবত কোনো মুক্ত সমাজে জন্মানো শিশুকেই করা হবে। তাঁর এই বক্তব্যের উপর চীন সরকার মন্তব্য করে, ‘‘নতুন দলাই লামার চয়ন কেবলমাত্র চীনা ‘গোল্ডেন আর্ন’ পদ্ধতি অনুযায়ীই হবে এবং এই প্রক্রিয়া শুধু চীনেই স্বীকৃত হবে।’’ এই প্রক্রিয়াটি কী, তা জানতে আমাদের অতীতে যেতে হবে।

১৯৫৯ সালে চীন হাজার বছর ধরে চলা তিব্বতের আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধ্বংস করে। তার জন্যই বর্তমান ১৪তম দলাই লামাকে তাঁর অনুসরণকারীদের নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত ভারত-তিব্বতের সেই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক নৈকট্য এবং করুণা-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক, যা তিব্বতীয় বৌদ্ধ পরম্পরার সঙ্গে হাজার হাজার বছরের সম্পর্ক। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ আরও অনেকেই দলাই লামার জন্মদিনে তাঁকে শুভকামনা জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু ব্যক্তিগতভাবে দলাই লামার জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকেন।

ভারত দলাই লামা এবং তিব্বতীয় শরণার্থীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের সর্বদা সম্মান দিয়েছে। অপরদিকে চীন দলাই লামার প্রতিপক্ষ অনেক বৌদ্ধ গুরু খাড়া করেছে। চীন এমনও চেষ্টা করে যে, দলাই লামা তাঁর মৃত্যুর আগেই চীনে ফিরে আসেন, যাতে তিব্বতের উপর চীনের অধিকারের নৈতিক ও সাংকেতিক স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে। এক পঞ্চেন লামাকে ঠিক করেও ফেলা হয়েছে, যা কিনা দলাই লামার পর দ্বিতীয় বড়ো আধ্যাত্মিক পদ। চীন তো দলাই লামাকে সিআইএ-র এজেন্ট বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। ২০১৭ সালে মঙ্গোলিয়া তাদের ওখানে দলাই লামাকে আমন্ত্রিত করে। বিষয়টা চীনের খুব একটা পছন্দ হয়নি, তাই তারা মঙ্গোলিয়ার উপর এতটা চাপ সৃষ্টি করে যে, তাদের লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হয় যে তারা দলাই লামাকে আর কখনও আমন্ত্রণ জানাবে না।

ভারতে বৌদ্ধমতের প্রাধান্যকে নিয়েও বিশ্বমঞ্চে চীন অনবরত বিভিন্ন দাবি তুলে চলেছে। কেননা সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের জন্য ভারতে বিশেষ স্থান রয়েছে। এই কারণে চীন ২০০৫ থেকে বৌদ্ধ কার্ড খেলছে। ২০০৬ থেকে চীন বহুবার ‘বিশ্ব বৌদ্ধ মঞ্চ’-এর আয়োজন করেছে। তাতে সারা বিশ্বের বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের আহ্বান করা হয়। তিব্বতের বৌদ্ধ পরম্পরার শিকড় ভারতের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। সংস্কৃতিগতভাবেও দুটি দেশের মধ্যে মিল রয়েছে। মানস সরোবর এবং জখোঙ্গ মন্দির বহু শতাব্দী ধরে আস্থার কেন্দ্র রূপে রয়েছে। যেসব দেবী-দেবতার পূজা ভারতে হয়, সেসব দেবী-দেবতার পূজা তিব্বতেও হয়। সেখানে দেবী তারার পূজা হয়, যা মা দুর্গারই একটি স্বরূপ এবং ওয়াঙ্গচুক ভগবান তো শিবেরই প্রতিরূপ। গুরু পদ্মসম্ভব এসব স্থাপন করেন, ওয়াঙ্গচুক ও তারাই বৌদ্ধ মঠের প্রমুখ দেবতা হবেন।

তথাগত বুদ্ধ তিব্বতে বহুবার এসেছেন। এমন মনে করা হয় যে তিনি যখন প্রথমবার আসেন সেসময় তিব্বত জলমগ্ন ছিল। তারপর তাঁর কৃপায় এই অংশ ঘন জঙ্গলে ভরে ওঠে, যাতে আর্য অবলোকিতেশ্বর এবং আর্য তারার অবতার বানর ও যক্ষিণী রূপে ঘটে। দ্বিতীয় মান্যতা অনুযায়ী তিব্বতের প্রথম রাজা ন্যী ত্রীৎসেনপো ছিলেন ভারতীয় রাজকুমার। তাঁর শাসনকাল ১২৭ খ্রি. পূ. বলে মনে করা হয় এবং তিনি সরাসরি স্বর্গ থেকে লুহারী গ্যাঙ্গদো নামক পর্বতে অবতরণ করেন। এই ক্রম অনুসারে তিব্বতের রাজা নিজেদের নেপাল ও বৈশালীর লিচ্ছবী বংশের (তথাগত বুদ্ধের বংশ) সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করার চেষ্টা করতেন।

পৌরাণিক গ্রন্থ এবং মহাভারতে এই তিব্বতকে ত্রিবিষ্টপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বহু ভারতীয় রাজার আসার বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভারতের এক রাজা ছিলেন সম্পতি। তিনি কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ

করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে ভয় পেয়ে ১০০০ সেনা নিয়ে তিব্বতে চলে আসেন এবং সেখানেই রাজত্ব করেন। তিব্বতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিহার হলো সম্যে ও শাক্য। সম্যে বিহারটি ভারত থেকে যাওয়া দুই বিদ্বান শান্তি রক্ষিত এবং পদ্মসম্ভব নির্মাণ করান। এই বিহারটির বাস্তু প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় উদন্তপুরীর ধাঁচে করা হয়েছিল। শাক্য মঠের নির্মাণ করা হয় বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে।

সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই তিব্বতের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সংটসেন গ্যাম্পো-র (৫৬৯-৬৪৯ খ্রি.) সিংহাসন আরোহণের পর সেখানে রাজনীতি সুব্যবস্থিত হয়। তিনি তাঁর রাজধানী লাসাতে স্থাপন করেন। ত্রিসঙ্গ দেৎসেনের শাসনকালে (৭৫৫-৭৯৭ খ্রি.) তিব্বতীয় সাম্রাজ্য চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তিনি বৌদ্ধমতকে রাজকীয় মত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর সেনা চীন-সহ মধ্য এশিয়ার বহু দেশ জয় করে। ৭৬৩ সালে তিব্বতীয়রা তৎকালীন চীনের রাজধানী চাঙ্গওয়ান (বর্তমান শিয়ান) ঘিরে ফেলে, যার ফলে ভয় পেয়ে চীনের রাজা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তিব্বতীয়রা সেখানে তিব্বত সমর্থক এক রাজাকে সেখানে নিযুক্ত করেন। এই বিজয়কে লাসার একটি অভিলেখে বিজয় স্মৃতি রূপে অঙ্কিত করা হয়। এতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, প্রতি বছর ৫০ হাজার রেশম গাঁট উপঢৌকনস্বরূপ চীন দেবে বলে চুক্তি হয়। ত্রিসাঙ্গ দেৎসেনের সময়েই বৌদ্ধমত রাজমহল ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাতে ভারত থেকে যাওয়া দুই বিদ্বান শান্তি রক্ষিত এবং মহাসিদ্ধ পদ্মসম্ভবের সবচেয়ে বড়ো অবদান রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ও পরে নালন্দা ও কাশ্মীর থেকে অনেক বিদ্বান তিব্বতে যান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দানশীল, জৈনমিত্র, ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, শান্তিগর্ভ প্রমুখ।

এখানে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উল্লেখ করা আবশ্যক। অতীশ দীপঙ্কর (৯৮১-১০৫৪ খ্রি.) ছিলেন বৌদ্ধমতের বজ্রযান শাখার মহান দার্শনিক এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা আচার্য। তিব্বতীয় গ্রন্থ অনুসারে আচার্য দীপঙ্করের জন্ম বঙ্গদেশের ঢাকার বিক্রমপুরে হয়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন যাকে বর্তমানে ভাগলপুরের সবৌর ক্ষেত্র রূপে উল্লেখ করেছেন। তিব্বতীয়রা মূলত ব্যবসায়ী। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য চলত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলেরা সম্পূর্ণ মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তিব্বত ও চীনকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে, কিন্তু মঙ্গোলদের মনে তিব্বতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাভাব ছিল। তাই তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে তৃতীয় তিব্বতীয় গুরু সোনম গ্যাৎসোকে মঙ্গোল শাসক আলতান খান তৃতীয় দলাই লামাকে উপাধি প্রদান করেছিলেন। দলাই শব্দ মঙ্গোল ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হলো সমুদ্র। তখন থেকেই বৌদ্ধগুরুদের নামের সঙ্গে দলাই লামা শব্দ ব্যবহার শুরু হয়। অর্থাৎ যার অগাধ জ্ঞান রয়েছে। তিব্বতীয়-মঙ্গোল সম্পর্ক সেসময় আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যখন মঙ্গোল রাজকুমার যোনতেন গ্যাৎসোকে চতুর্থ দলাই লামা রূপে মনোনীত করা হয়। গেদুন ড্রুপ-কে (১৩৯১-১৪৭৪ খ্রি.) আনুষ্ঠানিক রূপে প্রথম দলাই লামা রূপে স্বীকার করা হয়, যদিও তাঁকে এবং দ্বিতীয় দলাই লামাকে জীবনকালে এই উপাধি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম দলাই লামা লোসাঙ্গ গ্যাৎসোকে তিব্বতের আনুষ্ঠানিক রাজা ঘোষণা করা হয়। তিনি লাসাতে খুব সুন্দর পোটালা প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করান, যা আজও দলাই লামার প্রতীক রূপে রয়েছে। মোগল শাসনকালে ভারতে ইসলামি শাসকদের কারণে ভারতের বৌদ্ধমঠ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রমণ ও ভিক্ষুদের বিনাশ শুরু হয়। তার প্রভাব ভারত-তিব্বত সম্পর্কের উপরও পড়ে। তিব্বত স্বাধীন ছিল, কিন্তু চীন তার উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছিল এবং ব্রিটেন তাকে রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত রাখতে এক 'বাফার' রাজ্য রূপে দেখছিল। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ জেনারেল ইয়ং হসবেন্ড বড়লাট কার্জনের নির্দেশে তিব্বতের উপর সেনা অভিযান চালায়। এর ফলে ত্রয়োদশ দলাই লামাকে নির্বাসিত হয়ে ভারতে (দার্জিলিং) থাকতে হয়। ১৯১৪ সালের সিমলা চুক্তিতে ব্রিটিশ ভারত তিব্বতকে চীন থেকে স্বতন্ত্র 'স্বায়ত্ত এলাকা' হিসেবে পরিগণিত করে।

স্বাধীনতার পরেই তিব্বত নিয়ে নেহরুর নীতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিব্বতে চীনের সেনা অভিযান (১৯৫০) সত্ত্বেও ভারত এ বিষয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেনি। আর অজ্ঞাত কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তিব্বতকে চীনের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে উল্লেখ করেন, যদিও তিব্বত কখনোই প্রত্যক্ষ রূপে চীনের অঙ্গ ছিল না। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমানা ছিল কিন্তু তা নিয়ে কোনো বিবাদ ছিল না। যখন চীন তিব্বতের উপর অধিকার স্থাপন করে তখন সম্পূর্ণ হিমালয়েরই পরিদৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। চীন জোর করেই আমাদের প্রতিবেশী হয়ে যায় এবং তারা এই সীমারেখা নিয়ে বিবাদ শুরু করে। যে সীমারেখাকে চীন বিতর্কিত বলে উল্লেখ করে চলেছে তাকে ভারত স্বীকার করে না। ভারত ১৯৫০ সালেই স্পষ্ট করে দেয় যে, ১৯১৪ সালে ম্যাকমোহন সন্ধি হয়েছিল, ভারত তাকে অস্বীকার করে।

(লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ ভগৎ সিংহ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক মধুময় নাথের সেজদা চন্দন কুমার নাথ গত ১৩ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের ঘড়িবাড়ির বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অবিলম্বে তিন কোটি হিন্দু বাঙ্গালিকে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন

শহরের উন্নাসিক, উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালি হিন্দুদের 'ওবিসি' নিয়ে বলতে গেলেই তারা এক কথায় বলে ওঠে 'সব কোটা তুলে দিতে হবে' ইত্যাদি। এই বিষয়ে বলতে বা লিখতে গেলেই, 'সংরক্ষণ' কেন দরকার সেই প্রশ্ন তোলেন বহু মানুষ। অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, সাধারণভাবে এসসি, এসটি, ওবিসি বা ইডব্লুএস সংরক্ষণ আর হিন্দু বাঙ্গালি ওবিসি সংরক্ষণ সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সমস্যাটি বর্তমানে এক ভয়াবহ জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৯০-তে বাম সরকার তিন কোটি বাঙ্গালি হিন্দু ওবিসিকে বঞ্চিত করার ফলে বিহার, উত্তরপ্রদেশের ছেলে-মেয়েরা যেখানে ওবিসি কোটা নিয়ে কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসন, ব্যাংক, পোস্ট অফিসে চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের ছেলে-মেয়েরা দর্শক হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে যাঁদের পদবি উল্লেখিত হয়েছিল, ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁদের বাদ দিয়ে নিয়ে এলেন এমন কিছু তথাকথিত সংখ্যালঘুকে, যাদের আসার কথাই নয়। বিভিন্ন দপ্তরে তাদের চাকরি পাওয়া নিশ্চিত করতে ওবিসি সংরক্ষণকে 'এ এবং বি' দু'টি ভাগে ভাগও করে দেওয়া হলো। পরের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রাজ্যের প্রায় সব মুসলমানকেই ওবিসি কোটা দিয়ে ছেড়েছেন। শেষে গত বছর আদালতে হেরে যাওয়ার পর ঘুরপথে এই মুসলমানদের সংরক্ষণ বহাল রাখতে তাদের তিনি ইডব্লুএস কোটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০২৪— গরিব ও অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের (মাহিষ্য, কৈবর্ত, তিলি, বণিক, সদগোপদের) প্রতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়, অবিচার চলল। রাজ্য সরকার আদালতে হেরে যাওয়ার পর এবার তাতে যুক্ত হলো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য পরিবারের গরিবরাও।

আদালতে একের পর এক মামলা হেরে যাওয়া রাজ্য সরকার বহু বছর ধরেই ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাহিষ্য, কৈবর্ত, সদগোপ, তিলি, বণিকদের বাদ দিচ্ছে। প্রায় ৩৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে তাঁদের বঞ্চিত করা চলছে। আজকের দিনে রেলের স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্ক, ব্যাংকের ম্যানেজার ইত্যাদি পোস্টে যে সব বিহার বা ওড়িশার লোকজন দেখা যায়, তাঁদের একটা বড়ো অংশ কিন্তু এই রাজ্যগুলির ওবিসি-রা। কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি সমাজের একটা বড়ো অংশ ওবিসি সংরক্ষণ না পাওয়ায় কেন্দ্র, রাজ্য উভয় চাকরিতেই বঞ্চিত হয়েছে বাঙ্গালি ওবিসি-রা। এর আগে বামেদের ভূমি সংস্কার এবং ইন্দিরা গান্ধীর জাতীয়করণ নীতিতে মার খায় বাঙ্গালিরাই, যার মধ্যে বড়ো অংশ এই ওবিসি-রা। ব্রিটিশ আমলে লাহা, গুঁই, শীল, দাশ, মল্লিক, রায় মল্লিক, নস্কর, মণ্ডল, বসাকরা কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন। ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অসৎ, দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিলে এঁদের অধিকাংশই ব্যবসা ছেড়ে ধরেন চাকরি। গ্রামে মাইতি, জানা, কোনার, ঘোষরা হারালেন তাঁদের চাষের জমি। চলে এলেন কলকাতা বা দিল্লিতে। গ্রামে পুকুর থাকলেও নেতাদের অত্যাচারে মাছচাষের উপায়টাও নেই। এমতাবস্থায় ওবিসি সংরক্ষণ তাঁদের যে অক্সিজেন দিতে পারত, সেটাও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলি সরিয়ে নিল মুসলমান ভোটব্যাংকের আশায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অন্যায়টি করে গিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি এই কোটা তুলে দিয়েছেন মুসলমানদের হাতে। সেই কোটার সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের বহু ছেলে-মেয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে এত বছর ধরে। মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় সব ধরনের কোচিং যখন এদের দেওয়া হচ্ছে এবং তারপর সংরক্ষণের দৌলতে তারা যখন ভালো প্রতিষ্ঠানে ভালো বিষয় নিয়ে পড়ার বা সরকারি চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে, তখন সাধারণ মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালি এসসি, এসটি (তপশিলি জাতি ও উপজাতি) ও জেনারেল কাস্ট (বর্ণহিন্দু)-এর ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছে ঘুষ দিয়ে পিছনে দরজা দিয়ে টেট-উত্তীর্ণ শিক্ষকরা। ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পর ওবিসি সংরক্ষণের সাহায্যে এই তথাকথিত সংখ্যালঘুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে বেঙ্গল ক্যাডারে যোগ দিলে ১৯৪৬-এর পুনরাবৃত্তি হতে সময় লাগবে না। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে কিন্তু জাতের বিচার করে হিন্দুদের ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়নি। তাই এই ইস্যু শুধুমাত্র মণ্ডল কমিশনে নাম থাকা সত্ত্বেও সংরক্ষণ হতে বঞ্চিত হওয়া ওবিসিদের নয়। এটা সব হিন্দু বাঙ্গালির সমস্যা। জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে এই বছর। ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল হওয়ায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে অনেক দেরি করা হচ্ছে। কারণ আদালতের নির্দেশে ওবিসি তালিকা থেকে বাদ যাওয়া মুসলমানদের ইডব্লুএস সার্টিফিকেট দিয়ে পিছনের দরজা ব্যবহার করে ভর্তি করা হচ্ছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল এখনও পর্যন্ত বের করা হলো না। এখানেও কিছু আইনের ফাঁক বের করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষকে বুঝতে হবে যে, সমস্যাটি কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে! কীভাবে তাঁদের শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে ৩ কোটি হিন্দু বাঙ্গালিকে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন যাতে আইএএস, আইপিএস, রেল, ব্যাংক থেকে শুরু করে আইআইটি, আইআইএমে হিন্দু বাঙ্গালির প্রতিনিধিত্ব বাড়ে। এর সঙ্গে প্রয়োজন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, ব্রতচারী আন্দোলনের ধাঁচে হিন্দুসমাজের রেজিমেন্টেশন। যাতে সফল ব্যক্তিরা সমাজের অন্যান্যদের কাজ পেতে সাহায্য করতে পারেন, ব্যবসার সুযোগ করে দিতে পারেন। যেটা মাড়োয়ারি, গুজরাটি, সিন্ধি বা দক্ষিণী সমাজে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হিন্দু বাঙ্গালিদের ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়া। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৭ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ সীমা করতে পারলে প্রায় তিন কোটি হিন্দু বাঙ্গালির দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান হবে। তাঁরা পাবেন তাঁদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগসুবিধা। ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো এ বা বি শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত নয়। কোটা ভালো না খারাপ সেই বিতর্কে গিয়ে হিন্দু বাঙ্গালিকে বলির পাঁঠা বানিয়ে লাভ নেই। কারণ ইডব্লুএস (আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণী) এবং এসসি-এসটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের প্রতি একই অন্যায় ও অবিচার চলছে। □

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিকারে ভারতের হস্তক্ষেপ জরুরি

অমিত কুমার চৌধুরী

কিছুদিন আগে আমার এক মুসলমান বাল্য বন্ধুর সঙ্গে তার বাড়িতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম ওর স্ত্রী বাংলাদেশের। ওরই এক নিকট আত্মীয়ের কন্যা। বাংলাদেশের কথা উঠতেই আমার বন্ধু বলে উঠলো, বাংলাদেশ খুব সুন্দর দেশ, ওরা খুব অতিথিপরায়ণ ইত্যাদি। বহুদিন পর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বিতর্কিত, রাজনৈতিক বা ধর্ম, সম্প্রদায়গত বিষয় এড়িয়ে গিয়ে পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে ফিরে এলাম। মনে হলো আমার বন্ধু কি বাংলাদেশ তার শ্বশুরবাড়ি কিংবা মুসলমানপ্রধান দেশ বলেই বাংলাদেশের প্রশংসা করলেন?

অথচ কিছুদিন ধরে হিন্দুদের, বিশেষ করে হিন্দু নারীদের উপর মুসলমান জেহাদিদের ভয়ংকর, নির্মম, পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা মনকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করছে। ওই দেশটা বহু বছর থেকে হিন্দু ও প্রগতিশীল মুসলমানদের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। চূড়ান্ত ভাবে হিন্দু নারীর লাঞ্ছনায় সমাজ ও সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় মানবতা বিপন্ন, লাঞ্ছিত। এই নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি কি বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্নের ইঙ্গিত না নারী লাঞ্ছনার পাপের ফলে লঙ্কা ও কৌরবদের মতো বাংলাদেশের পতনের ইঙ্গিত? বাংলাদেশ কি বিশ্বমঞ্চে এক জেহাদি বর্বর দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চলেছে? সেখানে কি কোনো সুশীল সমাজ বলে কিছু নেই? হিন্দুদের পাশে কোনো রাজনৈতিক দল, মুসলমান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী কেউই কি নেই? আসলে সমগ্র দেশটাই এতো বেশি জেহাদি, হিন্দু বিরোধিতায় আচ্ছন্ন যে সরকারি মদতেই চলছে বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার এই প্রক্রিয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সবকিছুই প্রকাশ্যে এসেছে। বরিশালের এক হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। এক হিন্দুর নিকট মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে, তা দিতে অপারগ হলে প্রকাশ্য স্থানে কিছু উন্মত্ত জেহাদি যুবক সেই হিন্দুটিকে কী নির্মম ভাবেই না প্রহার করছে। আরেক হিন্দুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার সামনে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করছে ওই বর্বর জেহাদিরা। শুধু তাই নয়, ভিডিয়ো করে তা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবখানা এই যে দেখ, ইসলামি দেশে হিন্দুদের কী অবস্থা করে ছাড়ি আমরা। কুমিল্লায় এক অসহায় হিন্দু নারীকে তার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেয় যা বিশ্ববাসী দেখছে। ঢাকায় খিলখিত এলাকায় মুসলমানদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন হিন্দু মন্দিরে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেয় এবং দেবমূর্তিও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অথচ সেখানে আরও কিছু বেআইনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় অক্ষত আছে। ভাবখানা এই যে ইসলামি দেশে হিন্দুর কোনো অস্তিত্ব মানা হবে না। রংপুরে মাত্র দশ টাকা নিয়ে ঝামেলায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এক হিন্দু বৃদ্ধ ও তার ছেলেকে তাদের একটি ছোটো সেলুন থেকে টেনে বের করে বেদম মার দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানার পুলিশ প্রকাশ্যে সগর্বে ঘোষণা করছে যে, এমন কেস দেবে যাতে তার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন জেল হয়।

> **পশ্চিমবঙ্গেও শাসক দলের মদতে মুসলমান মোল্লাবাদীদের দাপট যেভাবে বেড়ে চলেছে তা রুখতে হিন্দুরা ব্যর্থ হলে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।**

চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভু আজও জেল থেকে মুক্তি পাননি। আদৌ পাবে কি না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আইনের রক্ষক মুসলমান উকিলরাই প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন, কোনো উকিল চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর হয়ে মামলা লড়লে তাকে দেখে নেবে। এক স্কুলে একমাত্র হিন্দু শিক্ষক ছিলেন, তাঁকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে স্কুল থেকে বলপূর্বক বিতাড়ন করা হয়েছে। এ যেন জোর যার মুলুক তার। চাকরি বাঁচানোর জন্য এক হিন্দুকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হয়। আওয়ামি লিগ করার জন্য হিন্দুর মন্দির ভাঙা হয় কিন্তু মুসলমানের একই পার্টি করার জন্য মসজিদ ভাঙা হয়নি। হামাসের সমর্থনে কথা বলেও আক্রান্ত হতে হয়, বাড়ি ছাড়তে হয় জলের গানের রাহুল আনন্দকে। যতই মুসলমানদের পক্ষে কথা বলো আসলে তুমি তো হিন্দু, কাফের, তাই ইসলামি দেশে তোমার কোনো স্থান নেই। শুনলাম তিনি বাংলাদেশ ছেড়েছেন। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার এক বহমান ধারা।

ঘটনাগুলি কয়েক মাসের বা গত জুলাই মাস থেকে। কিন্তু হিন্দু নির্যাতন ১৯৪৭ সালের পর থেকে কোনো দিনই বন্ধ হয়নি, ধারাবাহিক ভাবে আজও চলেছে সমানে, নেই তার কোনো থামার লক্ষণ। দেশভাগের ঠিক পরেই এক বিশালসংখ্যক হিন্দু সর্বস্বান্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৫০ সালে এক

ফঃ ২

কোটির উপর হিন্দু দেশত্যাগ করে। ১৯৭১ সালেও এক কোটি লোক এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকটি দশকে— পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই এবং তারপরে আজ পর্যন্ত হিন্দু নির্যাতনের কোনো ছেদ পড়েনি। অতীতের কিছু ঘটনা উল্লেখ করলেই তার প্রমাণ মেলে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে তার নিজ বাস ভবনে বিএনপি-জামাতে ইসলামি গুন্ডারা তাঁর মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর ভোলায় গৌর নদীতে হিন্দু যুবতীদের নির্যাতন করা হয়, রামশীলে তারা পালিয়ে গিয়েও রেহাই পায়নি।

২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন একটি নিবন্ধে লিখেছেন— এক হিন্দু বালিকাকে ধর্ষণ করতে এসেছে বিএনপি-জামাতের লোকেরা। তার মা হাতজোড় করে বলছেন, 'বাবারা আপনারা একজন একজন করে যান, আমার মেয়েটা ছোটো।' ২০০৪ সালে ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক আবেদ খান লেখেন, শেখ হাসিনাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ই-মেইল পাঠানোর মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কুমিল্লার মুরাদনগরের এক দরিদ্র মেধাবী ছাত্র শৈবাল সাহা পার্থর উপর এমন অত্যাচার করা হয় যে সে তাকাতে পারছে না হাঁটতে পারছে না, দাঁড়াতে পারছে না। কে বলেছে পার্থ অপরাধী নয়? তার নামটাই তো তার অপরাধের প্রমাণ। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পার্থর মা বলেন, ঠাকুর আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। ও কোনো দোষ করেনি। ও বড়ো ভালো ছেলে। ওর কিছু হলে আমরা বাঁচবো না। ঢাকা নিবাসী এক হিন্দু যুবতীর একটি স্কুটার এক মুসলমান যুবক বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। তাদের পরিবারে আগেও আক্রমণ, অত্যাচার হয়েছে, থানায় অভিযোগ করে কোনো সুরাহা না পেয়ে ওই হিন্দু যুবতী অসহায়ের মতো বলেছিলেন— ১৯৪৭ সালে তখন আমার দাদু কেন এই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়নি।

২০০৫ সাল নিউইয়র্ক টাইমস এক রিপোর্টে বাংলাদেশে তালিবানীকরণের এক রোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। উঁচু বাঁশের কাঠামোতে দুই পা বেঁধে মাথা নীচে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, লোহার রড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হয়। মৃত্যুর আগে এই অমানুষিক ভয়ংকর লোকটি যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে, তখন এলাকার মানুষ যাতে তা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পায়, তার জন্য তার মুখে মাইক্রোফোনের স্পিকার বেঁধে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা এক হিন্দু নারীর কথা শোনা যাক। 'বাংলাদেশে এক গ্রামে আমাদের বুথে বিএনপি হেরে যাওয়ার ফলে ওরা আমাদের বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে বেধড়ক পেটায়। আমি ওদের পায়ে ধরি, না মারার জন্য। ওই ছেলেরা আমার স্বামীর স্কুলেরই ছাত্র। তবুও তারা তাদের শিক্ষককে মারতে তাদের এতটুকু হাত কাঁপেনি। পরে আমাকে ও আমার মেয়েকে প্রায় অর্ধনগ্ন করে ফেলে। সেই হিন্দু নারী কাতর কণ্ঠে বলেন আমি এদেশে অনুপ্রবেশকারী নই, এক শরণার্থী। বাংলাদেশে হিন্দু নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের শান্তিবাদী এক গায়ক লোরকান অটওয়ে তার গানে লিখেছেন :

I'm a Bangladeshi Hindu girl, I can not say my name.

I can not show my face to you, I'm forced to flee in shame.

I can not find the words to tell, what they did to me.

When the gangs come to my village and robbed my dignity.

শেষ পঙ্‌ক্তিটি হচ্ছে :

Why is it not the rapist, who is forced to hide his face.

বিশিষ্ট সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এষা দে-র মতে হিন্দুরা মুসলমান মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে উত্থান ঘটাচ্ছে না বলেই বাকিরা এহেন হিন্দু নির্যাতনের ঘটনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিগত ৫০০ বছরের মধ্যে বঙ্গের একমাত্র যশোরের প্রতাপাদিত্য ছাড়া হিন্দুরা মুসলমান জেহাদিদের বিরুদ্ধে উত্থান ঘটায়নি। ভীরুতা, ক্লীবতা প্রদর্শন করে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও শাসক দলের মদতে মুসলমান মোল্লাবাদীদের দাপট যেভাবে বেড়ে চলেছে তা রুখতে হিন্দুরা ব্যর্থ হলে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই পরিস্থিতিতে দুই বঙ্গেই হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। □

বিশেষ ঘোষণা

স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত ৭৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তিকা পাঠে আগ্রহী বহু মানুষের কাছে ভাষাগত কারণে এটা সহজপাঠ্য হচ্ছিল না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু স্বস্তিকাপ্রেমী স্বস্তিকাপাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেইসব হিন্দিভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউণ্ডেসন-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা-র হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথির প্রাক্-লগ্নে আগামী ১৫ আগস্ট হিন্দি স্বস্তিকা (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করবে। আপাতত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মূল্য ধার্য হয়েছে ৩০্ টাকা।

আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পরামর্শ এই নতুন সংস্করণটির চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে— এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রকাশক,
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্টেসন

সেকুলার রাজনীতির নোংরা খেলায় হিন্দু ওবিসি সংরক্ষণ গুমরে কাঁদে

সিদ্ধানন্দ পুরকাইত

গত ৩৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে নোংরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা করার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, সেকুলার, জেহাদি তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলির অনৈতিক, অসাংবিধানিক তোষণনীতির সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গে এত বছর ধরে বঞ্চিত হয়ে চলেছে ওবিসি সমাজ। পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সংরক্ষণের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মণ্ডল কমিশন গঠনের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যের ভূমিপুত্র অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কাজ করেই চলেছে। সিপিএম, তৃণমূলের মতো শাসক দলের কবলে পড়ে দারিদ্র্যের বেড়াজাল ভেদ করতে পারছে না এই রাজ্যের গরিব হিন্দুসমাজ।

মণ্ডল কমিশন গঠন করে সারা দেশের সমস্ত রাজ্যের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর তালিকা সহজে প্রস্তুত হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তবেই হয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে যে, তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী চিহ্নিতকরণ করতে মণ্ডল কমিশনকে কোনো সহযোগিতা করেনি। সেই সময় বামফ্রন্ট সরকার 'বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী কমিশন' গঠন করে ৪২ দিনে একটি রিপোর্ট বানিয়ে দিয়ে দেয়। সেই রিপোর্টে বলা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কোনো অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানুষ নেই।

এতবড়ো একটা রাজ্যে কোনো অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নেই, বিশেষ করে ভারতের মতো একটি দেশের অঙ্গরাজ্যে এটা হতেই পারে না। ফলে স্পেশাল পারমিশন ও আইন পাশ করে মণ্ডল কমিশন নিজস্ব প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের ১৭৭টি জনগোষ্ঠীকে 'অনগ্রসর' হিসেবে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য যে, মণ্ডল কমিশন সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরি থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য যাচাই করে তবেই এই জনগোষ্ঠীগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছিল। ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ লোকসভায় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ পেশ করেন এবং ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব পাশ করান। রাজ্যগুলোকেও ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ ছিল— 'মণ্ডল কমিশন চিহ্নিত সব জনগোষ্ঠীকে ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়া হবে এবং এর বাইরে যদি কোনো অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থাকে তবে তা চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যভিত্তিক কমিশন গঠন করা যেতে পারে। রাজ্যের দ্বারা গঠিত কমিশন ওবিসি চিহ্নিতকরণ এবং ওবিসি সংরক্ষণ দিতে পারে।' দুর্ভাগ্যজনক যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেনি।

ফলে সারা ভারতে ওবিসি সংরক্ষ কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা হয়নি। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আন্দোলন সংগঠিত হলো। অনেকেরই ধারণা যে, পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সমাজ কোনো আন্দোলন করেনি বলেই তাঁরা বঞ্চিত, কিন্তু ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। ভারতের একমাত্র রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ওবিসিদের সংরক্ষণের আন্দোলন করে তাঁদের দাবি আদায় করতে হয়েছে। এসসি বা এসটি তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠীগুলিকে কখনও নিজেদের চিহ্নিতকরণ বা সংরক্ষণ চালু করার জন্য সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

> **অনুপ্রবেশকারী, দখলদার, জেহাদি, আক্রমণকারীদের কবলে পড়ে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র হিন্দুসমাজ আজ বিপন্ন।**

অনগ্রসর সমাজ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৩ সালে 'এ কে সেন কমিশন' গঠন করে এবং সেই কমিশনের সুপারিশ (মাত্র ৫ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ) মেনে গণশুনানির মাধ্যমে ওবিসি তালিকা প্রস্তুত করে। এখানেও অত্যন্ত কদর্য কাজ করে বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী মণ্ডল কমিশনের তালিকায় থাকা জনগোষ্ঠীগুলিকে ওবিসি সংরক্ষণ না দিয়ে তারা নিজেদের মতো শুনানি করে এবং নতুন করে হওয়া এই শুনানির মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের জনগোষ্ঠীগুলিকে ওবিসি সংরক্ষণ দেয়। ফলে শুরুতে মাত্র ১৮-২০টা মণ্ডল কমিশন তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠী ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ পায় এবং যে জনগোষ্ঠীগুলি মণ্ডল কমিশনের তালিকায় ছিল না রাজ্যের তালিকায় তারা ঢুকে যায়। অর্থাৎ ওবিসি সংরক্ষণ এবং রাজ্য সরকারে ক্ষমতাসীন দলের ভোটব্যাংক রাজনীতি এখানে ফুটে ওঠে।

ওবিসি সংরক্ষণ চালুর সময় পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সমাজের বুকে সব থেকে বড়ো ছুরি মারে বামফ্রন্ট সরকার এবং তদানীন্তন সংরক্ষিত জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্ব। উভয়ে জোটবদ্ধ হয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের সীমা রাখা হয় মাত্র ৫ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণের সীমা ছিল ২৭ শতাংশ। কাহিনির এখানেই শেষ নয়। ওবিসি সমাজকে বঞ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের এসসি সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ হলেও, পশ্চিমবঙ্গের এসসি সংরক্ষণ ২২.৫ শতাংশ করে দেওয়া হলো। এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ওবিসিদের বঞ্চিত করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সংরক্ষণের আওতায় আনার মাধ্যমে তুষ্টীকরণের রাজনীতির নজির সৃষ্টি করল বামফ্রন্ট সরকার। এটাই বাস্তব যে, এত বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে অতীতের বামফ্রন্ট সরকার থেকে বর্তমান তৃণমূল সরকার সুপরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত নোংরা খেলা খেলে চলেছে। রাজ্য সরকার প্রণীত নীতি রাজ্যের ভূমিপুত্র ওবিসি সমাজের বঞ্চনার কারণ

হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রী থেকে রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব এই রাজ্যের ভূমিপুত্র না হওয়ার ফলে রাজ্যের শাসক দলগুলি চিরকাল একশ্রেণীর উদ্বাস্তু তোষণের ছত্রছায়ায় ভোটব্যাংকের সংকীর্ণ রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছে যার বলি হয়েছে ওবিসি সমাজ।

রাজনীতির নোংরা পাঁকে বঙ্গীয় ওবিসি সমাজকে ডুবিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে গভীর চক্রান্ত ও নোংরামি করে গিয়েছে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মানুষ তার ফল ভোগ করছে। এক কথায় 'কৃষক-শ্রমিক-গরিব-মুটে-মজুর'দের বন্ধু সেজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত গরিবের বড়োমাপের সর্বনাশ করে গিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। ২০১০ সালে 'ওবিসি সংরক্ষণ'কে সাম্প্রদায়িকীকরণের কাজ করে গিয়েছিল তারাই। সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর তারা মুসলমান নাম ও পদবিভিত্তিক ওবিসি সংরক্ষণ চালু করে। ওবিসি এ ও বি-এর শ্রেণী বিভাজন করে। ফলে মুসলমানরা ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় চলে এলেও বঞ্চিতই রয়ে গেল হিন্দুসমাজ। এই সংরক্ষণের ফলে আজ ধীরে ধীরে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বা 'মিনি পাকিস্তান' হওয়ার দিকে হেঁটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। সাচার কমিটির রিপোর্ট সামনে আসার পর গদি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, ভোটের লোভে দেশের আইন-কানুন, সংবিধানবিরোধী কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের চিরস্থায়ী ক্ষতি করে গিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

রাজ্যে তোষণ এবং পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির জন্ম দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। ওবিসি সংরক্ষণ চালুর সময়েও উদ্বাস্তুদের একটি বিশেষ শ্রেণীকে তোষণ করতে গিয়ে তারা এসসি (তপশিলি জাতি) সংরক্ষণ সীমা বৃদ্ধি করে। ২০০৯-এর পর সরকারের পতন নিশ্চিত হওয়ায় মরিয়া হয়ে মুসলমান তোষণ করতে গিয়ে তারা ধর্মের ভিত্তিতে ওবিসি সংরক্ষণ চালু করে। তাদের তৈরি ওবিসি-এ ও বি-র শ্রেণী বিভাজন মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং গরিব, অনগ্রসর হিন্দুসমাজের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯০ পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন কোনো সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ বাস্তবায়িত করেনি। অন্যান্য রাজ্যে ১৫ শতাংশ এসসি সংরক্ষণ চালু থাকলেও এই রাজ্যে তা হয়েছে ২২.৫ শতাংশ। নাম ও পদবি অনুযায়ী মুসলমান ওবিসি তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওবিসিদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন সৃষ্টি করেছে এই রাজ্যের সরকারই।

আদতে সমাজ ধ্বংস হয় শিক্ষিত মানুষদের অশিক্ষিতের মতো আচরণের কারণে। এটা বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের জন্য একেবারে বাস্তব। সেই সঙ্গে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র কৈবর্ত-মাহিষ্য-কুড়মি জনগোষ্ঠীর তদানীন্তন শিক্ষিত নেতাদের অদূরদর্শিতা বা বামপন্থা-জারিত মহানুভবতা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের আজকের এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেকুলার, ভোটভিখারি শাসক দলগুলির মদতে পশ্চিমবঙ্গে অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্য (ডেমোগ্রাফি) ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ভূমিপুত্র সমাজের জায়গা-জমি, সম্পদ থেকে শুরু করে চাকুরি-শিক্ষা সব কিছুর দখল কীভাবে হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে তা অনুসন্ধান করলেই উঠে আসবে প্রকৃত চিত্র। ধারাবাহিক ও অবাধ অনুপ্রবেশ এবং সেকুলার আগ্রাসনের কবলে পড়ে হিন্দু ওবিসি ও ভূমিপুত্র সমাজ আজ চরম সংকটের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। অনেকেই হিন্দু ওবিসি বঞ্চনার মূল হোতা ভাবছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আদতে বামফ্রন্টের মেধাবী ছাত্রী এবং মুসলমান তোষণের পথিকৃৎ হিসেবে বামফ্রন্টের অসমাপ্ত কাজকে সদর্পে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। এটা তার ভোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা। বর্তমান রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে নিতে পারতেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা করলেন না। ওবিসি-এ-তে বরাদ্দ ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ। হিন্দুরা ছিল 'ওবিসি-এ' সংরক্ষণ হতে বঞ্চিত। রাজ্যের এই সংরক্ষণ নীতি বাতিল করে হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী চাইলে আর্থিকভাবে দুর্বল, অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের ইডব্লুএস (ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করতে পারতেন এবং স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করে বাতিল হয়ে যাওয়া ওবিসি সার্টিফিকেটগুলির পরিবর্তন করে ইডব্লুএস দিতেই পারতেন। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। এছাড়াও তিনি মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে পারতেন।

গত বছর ২২ মে রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাদের রায়ে হাইকোর্ট জানায় যে, রাজ্যের ওবিসিদের তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। নির্দিষ্ট কোনো তথ্য ছাড়াই 'ওবিসি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায় রাজ্য। হাইকোর্টের রায়ের উপর কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। এরপর অভিযোগ ওঠে হাইকোর্ট শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকর করছে না রাজ্য। অনেক জায়গায় নতুন করে ওই সার্টিফিকেটের ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এমনকী, প্যানেলও প্রকাশ করা হয়। গত মার্চে এ বিষয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। গত ৬ মার্চ হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে আদালতে হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে কেন আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। হাইকোর্টের তলবের কারণে গত ১২ মার্চ আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। বিচারপতিদের প্রশ্নবাণের সামনে পড়ে 'ভুল' স্বীকার করেন তিনি। শুনানিতে বিচারপতি মান্থা বলেন , 'আপনারা কেন আদালতের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের নির্দেশের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ? ২০১০ সালের আগে যাঁরা ওবিসি শংসাপত্র পেয়েছেন, তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। তাঁদের নিয়োগে তো কোনো বাধা নেই। আদালত তার নির্দেশে তা স্পষ্ট করে বলেছিল।' এছাড়াও অন্য একটি মামলায় গত ১৭ জুন রাজ্যের তৈরি নতুন ওবিসি সংরক্ষণ নীতিতেও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। একের পর মামলা হেরেও গরিব, অনগ্রসর হিন্দুসমাজকে বঞ্চিত রাখতে সক্রিয় এই রাজ্যের নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী ও তার দল। তার ভোট রাজনীতির কবলে পড়ে গুমরে মরছে হিন্দু ওবিসি, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যের ভূমিপুত্ররা। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে মানবতাবোধ ও রাষ্ট্রবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে পাথেয় করে রাজ্য জুড়ে 'ভূমিপুত্র অধিকার রক্ষা আন্দোলন' গড়ে তোলা বিশেষ জরুরি। অনুপ্রবেশকারী, দখলদার, জেহাদি, আক্রমণকারীদের কবলে পড়ে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র হিন্দুসমাজ আজ বিপন্ন। রাজ্যের জনবিন্যাস পুরোপুরি পালটে গেলে তাঁদের দেশছাড়া হতে খুব বেশি দেরি নেই। □

‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে’

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে দুই বিপরীত চরিত্রের বালক— গোপাল ও রাখালের কথা তুলে ধরেছেন। দুটোই গল্পের প্রয়োজনে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। গোপাল সুবোধ, শান্ত, পড়াশোনায় মনোযোগী। অপরদিকে রাখাল দুষ্ট, পড়াশোনায় অমনোযোগী। তিনি গোপালকে সুবোধ বালক বলেছেন ঠিকই কিন্তু রাখালকে কুবোধসম্পন্ন বালক বলেননি। বর্তমানের টিভি অন্তর্জালের জমানায় বাল্যাবস্থাতেই কুবোধ জন্মাতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরিপক্ব কুবোধ যে কতখানি সর্বনাশা হতে পারে তার নির্দশন মিডিয়া অহরহ দিয়ে চলেছে। রাখাল নিশ্চিতভাবেই দুষ্টু ছিল কিন্তু কোনো অর্থেই নোংরা ছিল না। দুষ্টুমি ও নোংরামি কখনোই এক নয়। মদ গাঁজায় আসক্তি, মারামারি করা, ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়া যার স্বভাব বৈশিষ্ট্য— সেরকম কোনো বালক চরিত্র বিদ্যাসাগরমশাই তার কোনো গ্রন্থেই তুলে ধরেননি। কারণ, তদানীন্তন সময়ে এটা ছিল ভাবনারও অতীত।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি আইন কলেজের শাসকদলের ছাত্রনেতাটি দাদা জেঠুদের নয়নমণি এবং সে নাকি ছোটোবেলা থেকেই বহুমুখী গুণের অধিকারী। কোনোপ্রকারে পড়াশোনা শেষ করে রাজনীতির ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা ধর্ষকটির চরিত্র বিদ্যাসাগরীয় ব্যাখ্যান খুঁজে না পাওয়া গেলেও কেতাবি জ্ঞানগম্যির বাইরে মেধার বিচারে সে সুবোধের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। গবেট তো তাকে বলাই যাবে না। এও শোনা যাচ্ছে ইতিপূর্বে অনেক ছাত্রী তার কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়েছেন। এতদ সত্ত্বেও সে তার লুম্পেন সাম্রাজ্য শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পেরেছে। এর জন্য বুদ্ধি লাগে। মেধাবী পড়ুয়া ছেলেরা ন্যায্য চাকরির দাবিতে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে অবস্থান বিক্ষোভ করে চলেছেন, আর একে দেখুন--- সাদামাটা ভাঙ্গাচোরা একটা কেরিয়ার, দিব্যি একটা সরকারি কলেজে কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। কুবোধ বালকেরা যে বুদ্ধিমান হয় না এটা সব সময় বলা যাবে না। সমাজের প্রথম সারির ছাত্র-ছাত্রীরা আজ ডাক্তারি শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত। তাদের মধ্যে অবশ্যই কুবোধযুক্ত মেধাবীরাও থাকেন। না হলে হাসপাতালের মধ্যে এক ডাক্তারি শিক্ষার্থীর ধর্ষণ ও হত্যা সম্ভব হয় কীভাবে?

একজন ড্রাগ আসক্ত মানুষ শক্তপোক্ত, স্বাস্থ্যবতী কোনো যুবতীকে ধর্ষণ ও হত্যা করতে পারে, এটাও বিশ্বাসযোগ্য? এটা যে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় তা আরেকবার প্রমাণিত হলো হালের আইন কলেজের ধর্ষণের ঘটনায়। নিপীড়িতা মেয়েটির বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, কসবা কাণ্ডে তথাকথিত ছাত্রনেতাটি অন্য দুই ছাত্রের সাহচর্যে এই ঘৃণ্য অপকর্মটা ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। ধর্ষিতা এই অভাগিনীদের সমাজ একটা করে নাম দিয়ে থাকে— দিল্লির ঘটনায় অভাগীর নাম ছিল নির্ভয়া, আরজি করে অভয়া। জানি না এই অভাগিনীর নাম এখনো আদৌ দেওয়া হয়েছে কিনা। এ গণধর্ষণকাণ্ডে অভাগীর সৌভাগ্য এই যে, ওই পাষণ্ডদের হাতে তাঁর প্রাণ যায়নি, না হলে তাঁকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হতো কোনো প্রভাবশালী তাকে ধর্ষণ করেনি। এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতির মুক্তাঙ্গনে মন্তব্যের রঙ্গ তামাশা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বাঙ্গালি এত বেশি পলিটিক্যাল পোলারাইজড হয়ে পড়েছে যে বানতলা, ধানতলা, সিঙ্গুর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, হাঁসখালির ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। দাদা বা দিদিরা যখন কোনো ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে ধিক্কার না জানিয়ে কেবলমাত্র মুখ রক্ষার তাগিদে ঔদ্ধত্যের খোলসে ঢুকে পড়ে, বলেন— এমন তো কতই ঘটে! বা ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, আমাদের মতো পার্টির জন্য বলি প্রদত্ত, অন্ধ ভক্তদের আর নতুন করে ভাববার কোনো অবকাশ থাকে না, বলার মতো কথা থাকে না।

> “প্রতিটি জাতির মনের কোণায় একটা মিথ্যা আবেগ থাকে। যা একটুখানি আহত হলেই সরবে বিস্ফারিত হয়। আর ভণ্ড রাজনীতিবিদরা এই আহত জন-আবেগকে সুকৌশলে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাওয়ার লক্ষ্যে কাজে লাগিয়ে নেয়।”

পার্ট স্ট্রিটে ইংরেজি বর্ষবরণের নৈশ আনন্দে অংশ নিয়ে সুজেট কী অন্যায় করেছিলেন? ওই দিনে প্রতিবছর হাজার হাজার যুবক-যুবতী সেখানে জড়ো হয়, প্রকাশ্যে রাতভর আনন্দ করে। দূরদর্শনের দৌলতে সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানে। সাধারণের জানা আর অসাধারণের (নেতা-নেত্রীদের) জানা দুইয়ের মধ্যে অবশ্যই ফারাক আছে। যে কোনো ঘটনাকে তাঁরা দেখেন রাজনৈতিক লাভালাভের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সুতরাং ঘটনাসাপেক্ষে উল্লম্ফ দিকপাতে তাদের মন্তব্য, মূল্যায়নকে কখনোই বিচার করা যাবে না। তাই ধর্ষকদের রক্ষক, উৎসাহদাতারা যখন বলেন, রাতবিরেতে বা দিনেও মেয়েরা একা পুরুষদের সঙ্গে থাকবে কেন? আইনের ছাত্রীটি ওই ঘরে না গেলে তো আর ধর্ষিতা হতো না! আমরা অবাক হই না। নিজের দৈনন্দিনের কর্মক্ষেত্রে হাসপাতালের মধ্যে একজন ডাক্তারি পড়ুয়া যুবতীর ধর্ষণ ও হত্যা হলো।

সাদা কলারের দোষীদের কারও কিছুই হলো না। আবারও এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা

ঘটলে এবার রাজনীতি ব্যাপারিরা হয়তো বলবেন, মেয়েদের আবার ডাক্তারি পড়ার শখ কেন? আইন ও ডাক্তারি বিদ্যার ছাত্রী ধর্ষিতা ও খুন হচ্ছেন অপর আইনজীবী বা ডাক্তারদের দ্বারা বা তাদের পরোক্ষ মদতে, চক্রান্তে। কিন্তু মজার ব্যাপার, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ঘরের মেয়েদের এই দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয় না। অন্ততপক্ষে আজ পর্যন্ত এরকম খবর শোনা যায়নি। মনে হয়, তাদেরও যদি কখনো এরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেদিন তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে ব্যক্তি মানসে ও পরিবার পরিসরে একটা দুর্ভাগ্যজনক ধর্ষণের প্রভাব কতখানি? তখন বাতেলাবাজি সব ঘর ঢুকে যাবে।

কয়েকদিন আগে The Hindu-তে প্রকাশিত আমেরিকা থেকে প্রচারিত একটা খবর শুনে একজন ভারতীয় হিসেবে ভেতরে ভেতরে বেশ আহত হলাম। মার্কিনদের এরূপ বক্তব্যে আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে, বিশেষ করে যখন অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যসৃষ্ট জাতীয়তাবাদী আবেগ এখনো টাটকা, হৃদয় আবিষ্ট। পাকিস্তানের ত্রাতা আমেরিকা আমাদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করলে আত্মশ্লাঘায় লাগারই কথা। আমেরিকান দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে— পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র-সহ ভারতবর্ষের কতিপয় রাজ্য সন্ত্রাস ও ধর্ষণপ্রবণ; অতএব ভ্রমণ পিপাসু আমেরিকানদের এই সমস্ত রাজ্যে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে বা ভ্রমণকালে সাতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হচ্ছে। বাল্যকাল হতে খরাপ্রবণ, বন্যাপ্রবণ মায় দুর্ঘটনাপ্রবণ কথাগুলো শুনে আসছি, ধর্ষণপ্রবণ এই প্রথম শুনলাম। ধর্ষণ কি পৃথিবীর কোথায় হয় না? আমেরিকাতে হয় না? বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, ষষ্ঠ শক্তিশালী সামরিক শক্তি, বৃহত্তম গণতন্ত্র, সর্বোচ্চ জনবহুল দেশ—এত কিছুতে এগিয়ে; অনেকটা ঠিক 'এগিয়ে বাংলা'র মতো; তথাপি একতরফাভাবে আমাদের সম্পর্কে কু-প্রজ্ঞাপন!

আসলে প্রতিটি জাতির মনের কোণায় একটা মিথ্যা আবেগ থাকে। যা একটুখানি আহত হলেই সরবে বিস্ফারিত হয়। আর ভণ্ড রাজনীতিবিদরা এই আহত জন-আবেগকে সুকৌশলে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাওয়ার লক্ষ্যে কাজে লাগিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভণ্ড জাতীয়তাবাদ (false vanity on nationalism) থেকে সকলকে সাবধান করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'নিজের প্রতি বা আপন জাতির প্রতি যে অন্ধ আনুগত্য বা ভালোবাসার বোধ, সে আত্মহত্যার নামান্তর। এই স্বাজাত্য প্রীতি স্বদেশের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে না।' আমরা গড় ভারতীয়রা মুক্তমানব হতে পারেনি, তাই আমাদের লোক দেখানো জাতীয়তাবাদ, ঠুনকো মর্যাদাবোধ, স্বাজাত্যপ্রীতি বিদেশিদের সঠিক সমালোচনায় আহত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে মাতৃশক্তির আরাধনা করা হয়, লোকবরেণ্যা নারীরা দেবীরূপে পূজিতা হন।

ভাবতে অবাক লাগে, এরকম একটা দেশ, জাতি কতখানি অধঃপতিত হলে, আমেরিকার মতো একটা উন্মার্গগামী, বিকৃত যৌনাচারের দেশ এরকম কথা বলতে পারে! মহাজাগরণের অগ্রদূত স্বামীজী বলে গেছেন— 'হে ভারত— ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।' এরা যারা এরূপ নক্কারজনক ঘটনা ঘটায় তাদের আদর্শ কে? উপাস্য কারা? ধর্ষকরা অনুপ্রাণিত হয় কোত্থেকে, কে জানে! আসলে এদের মনোরাজ্যেই যত সমস্যা। এরা একজন নারীকে, মানবিক দৃষ্টিতে--- এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, মেধা ও মননশীলতার আধার হিসেবে দেখতে পারে না, তাকে শুধুই এক মাংসাবয়ব, ভোগের উপকরণ হিসেবেই বিবেচনা করে। নিত্য নতুন শিকারের অপেক্ষায় এরা ওঁত পেতে থাকে। কসবাকাণ্ডের ধর্ষকত্রয়ীর মধ্যে শোনা যাচ্ছে, একজন নাকি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, পাড়ায় তার কোনো বদনাম নেই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে— এত বড়ো কাণ্ডটাতে সে অংশ নিল কী করে? পুরোটাই তো পরিকল্পিত এবং তা সংঘটিত হয়েছে এই তিনজনের পরিকল্পনায়।

এরকম হত্যার বিচারে বিচারকরা নাকি সব হত্যাকারীকে সমান শাস্তি দেন না। পরিকল্পিত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা আর মুহূর্তের উত্তেজনায় হত্যাকে তাঁরা এক দৃষ্টিতে বিচার করেন না। পরিকল্পিত হত্যার শাস্তি হয় গুরুতর; কারণ, তাঁরা মনে করেন এ ধরনের হত্যাকারীরা হচ্ছে জাত অপরাধী। তাহলে আশা করা যায় আইন কলেজের কাণ্ডে অপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে এবং নির্যাতিতাও ন্যায্য বিচার পাবেন, কেননা কপালজোরে তিনি বেঁচে আছেন। এবার তার সমস্ত রকমের ডাক্তারি পরীক্ষা, পুলিশের রিপোর্ট— এগুলো যদি সঠিকভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় আসে, রাজনৈতিক স্বার্থে কোনো কিছু গোপন না করা হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি সুবিচার পাবেন। তবুও আমরা এ ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিঃসন্দেহ নই, কারণ, অভয়ার মা-বাবা এখনো সুবিচারের আশায় অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছেন। অভয়াকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে শাসকের কে যেন একজন বলেছিলেন, ধর্ষকদের গুলি করে মারা উচিত। এবার দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের এই জঘন্য ঘটনাকে নিয়ে তিনি কিছু বলেছেন কি? জানা নেই।

প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় এখনো ধর্ষক ও ধর্ষিত পক্ষদ্বয়কে নিয়ে সালিশি সভা বসে। সেখানে ধর্ষকপক্ষের মাতব্বরেরা (গ্রাম, শহর, রাজ্য ছাড়িয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও মাতব্বরেরা ধর্ষকের পক্ষে থাকে বলেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে) টাকার বিনিময়ে দু'পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট করে দেয়। এই ঘটনায় নির্যাতিতার মা-বাবা-সহ তার পরিবার এবং শুভানুধ্যায়ীরা আগামীদিনে কী অবস্থান নেবেন তাতেই নিহিত রয়েছে বিচার-অবিচার-সুবিচারের ভবিষ্যৎ। সকল মাতা-পিতাই সর্বান্তঃকরণে চান তার সন্তানের উপর অত্যাচারের বিচার হোক। এক্ষেত্রেও নির্যাতিতার মা-বাবা সেরকমই চাইবেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী এই রাজ্যে তাঁর মা-বাবা যদি অপত্য স্নেহ, মায়া-মমতা অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অঙ্গুলিহেলনে ব্যতিক্রমী পরিবর্তিত অবস্থান নেন, তাহলে বিচার প্রার্থী বাঙ্গালি-মানস কোনোদিন তাদের ক্ষমা করবে না, কারণ এর মাধ্যমে তিনি আগামীর ধর্ষকদের বরাভয় দিয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ স্বাধীন নয়। সংখ্যালঘুরা (শাসক শ্রেণী) তাদের এমন একটি লক্ষ্যে চালিত করে যা তাদের কাছে অজানা।

□

ড. ইউনুস আখের গুছিয়ে ফেলেছেন। তাই এখন তার পালাই পালাই অবস্থা। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে কেউ নাকি তাঁর কথা শুনছে না। এও বিশ্বাস করতে হবে?

মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত
ড. ইউনুস প্রভুদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে মহাব্যস্ত

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

মানুষ কতটা নৃশংস বা নির্মম হতে পারে? একটি জাতি কতটা ভয়াবহ হলে বর্বর ও অসভ্য হয়ে ওঠে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের আর দূরে তাকাতে হয় না, আজকের বাংলাদেশেই তার জবাব স্পষ্ট। এখানে প্রতিদিনই এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পশুত্বকেও হার মানায়। সমাজে এখন যারা দুই পায়ে হাঁটে, তাদের অনেকেই যেন রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণী। এদেরকে আর মানুষ বলা যায় না, কারণ মনুষ্যত্ব এখানে অস্তিত্বহীন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। নৃশংসতা আজ শুধুমাত্র কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি ক্রমে একটি স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম খুললেই চোখে পড়ে এমন সব খবর, যা বিবেকাবান মানুষকে হতবাক করে তোলে।

- দিনের আলোয় শিশু ধর্ষণ।
- মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্তৃক শিশু বলাৎকার ও হত্যা।
- বোবা কিশোরীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ ও পরে হত্যা।

এসব ঘটনা শুধু পৈশাচিকতা নয়, বরং সমাজে শিশুদের প্রতি নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, তারই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বছরে গড়ে প্রায় ১৮০০ শিশু যৌন হিংসার শিকার হচ্ছে। আরও অবাক হওয়ার বিষয় হলো তাদের বিচার হয় না।

- মসজিদের ভেতরে নারী ধর্ষণ।
- অন্তঃসত্ত্বা পুলিশ সদস্যকে থানার বাইরে এনে পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা।
- ঘরে ঢুকে মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণের পরে হত্যা।
- স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে উভয়কে হত্যা।

চলন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা।

এই ঘটনাগুলো শুধু লোমহর্ষক নয়, বরং একটি শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতনের ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ‘ধর্ষকের দেশ’ হিসেবে তকমা পেয়েছে। ওখানে মহিলা ধর্ষণকে উগ্র জঙ্গি মুসলমান মৌলবিরা ফতোয়া জারি করে অনেকাংশে বৈধ করে তোলে। শিশু বলাৎকারকে অনেক সময় শয়তানের নির্দেশে হয়ে থাকে বলেও তারা বিশ্বাস করে।

Amnesty International বলছে, বাংলাদেশে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ‘rampant and normalized’, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শাস্তি পায় না।

- রাজপথে কুপিয়ে মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করা।
- হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা।
- জীবন্ত মানুষকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা।
- পুলিশের সামনে জনতা কর্তৃক পিটিয়ে হত্যা।

এই ঘটনাগুলো শুধু আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা নয়, বরং পুরো সমাজের পশু চরিত্রকে উন্মোচন করে। এ ক্ষেত্রে দেশকে নীরব ও নির্বিকার দেখা যাচ্ছে। ভাবটা এমন যে এই রকম ঘটনা মামুলি ব্যাপার। আমরা এইরূপ ক্রিয়াকে সরকারের সমর্থনপুষ্ট মনে করি, সরকারের মৌনতাই এই সকল কাজকর্মের অন্যতম কারণ।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে শারীরিক নির্যাতনের পর মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যারা বিচার ব্যবস্থাকে ঠুনকো বানিয়েছে তারাই এখন দেশের উঁচু আসনে আসীন রয়েছেন।

- আদালতের ভেতরে বিচার চলাকালীন ডিম ছুঁড়ে মারা।
- জেল থেকে দেশদ্রোহীদের মুক্তি।
- অপরাধীদের কারাগার ভেঙে পালানোর সুযোগ দেওয়া।

এই সব ঘটনা প্রশাসনকি বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। Transparency International Bangladesh (TIB) ২০২৪ সালে বলেছে--- 'বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে।' প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পুরা দেশের অস্তিত্বকেই বিলীন করে চলেছেন। তিনি যা চাইছেন তাই করতে পারছেন।

- সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন।
- হিন্দু কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অস্ত্রের মুখে পদত্যাগে বাধ্য করা।
- সাধু-সন্ন্যাসীদের জেলে আটকানো।
- সংখ্যালঘু মানুষদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া।
- শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সমাজের মেয়েদের ওপর হামলা।

শোক সংবাদ

আরোগ্য ভারতী পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক তথা সঙ্ঘের প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডলের ছোটোভাই, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা মহকুমার গুরুদাসপুর শাখার স্বয়ংসেবক মঙ্গল মণ্ডল গত ১০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

এই ঘটনাগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার চর্চার দৃষ্টান্ত নয়, বরং একটি ভয়ংকর মজহবি সন্ত্রাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংকেত।

একটি বেসরকারি সংস্থার তথ্য মতে, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে দেশে অন্তত ২০ হাজারটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে, যার কোনোটির বিচার হয়নি এবং হবেও না।

- বিচারহীনতা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা।
- সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো--- অপরাধীরা জানে, তাদের কিছুই হবে না।
- অপরাধী পরিচিত হলে তারা হাসপাতালে ভিআইপি সুবিধা পায়।
- মজহবি বা রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে আইনের ঊর্ধ্বে থাকে।
- ধর্ষণ করে ভিডিয়ো ভাইরাল করে আনন্দ পায়।
- হত্যা করে ছবি ফেসবুকে আপলোড করে। আর প্রশাসন নির্বিকার, নিঃশব্দ, নিষ্ক্রিয়।

জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশনের ২০২৪ সালের এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, 'There is a systematic erosion of accountability in Bangladesh.'

১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তি ছিল— মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজ।

মুক্তিসেনারা চেয়েছিলেন একটি ন্যায়ভিত্তিক দেশ, যেখানে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু আজ সেই বাংলাদেশে—

- জীবনের মূল্য নেই।
- নারীর সম্মান নেই।
- সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নেই।
- বিচার নেই।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশ আজ একটি ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই পরিস্থিতি দেশটিকে ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এক ভয়াল ইতিহাস রচিত হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলোর বাড়িতে ভারী অস্ত্রের মজুদ নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট থাকলেও কার্যকর অভিযান চালানো হয়নি। গৃহযুদ্ধের আদলে শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত ঘটনাও।

সকলের মনে আছে ১৯৭১ সালে পরাজয়ের সময় পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'আমাদের সৈনিকেরা তোমাদের মেয়েদের গর্ভে যা রেখে যাচ্ছে, একদিন তা তোমাদের সমাজকে ছিঁড়ে ফেলবে।' এই উক্তি ছিল ঘৃণ্য, নিন্দনীয়— তবে আজকের বাস্তবতা যেন তা ভয়াবহভাবে সত্যে রূপ নিচ্ছে। যারা তখনকার 'পরিচয়হীন প্রজন্ম' বলে চিহ্নিত, তাদের একটি অংশ আজ অপরাধ জগতের নিয়ন্ত্রক। দেশের ধারক ও বাহক। এটা যদিও বিভ্রান্তিকর, তবু বাস্তবতাকে অস্বীকার করাও অসম্ভব। পিতৃ পরিচয়হীন এই সকল নরপশুরাই বাংলাদেশে মানুষকে বিশেষভাবে হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছে এখন।

ড. ইউনুস তাঁর প্রভুদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে মহাব্যস্ত। ইতিমধ্যে তিনি দেশের সুদখোরের অভিভাবক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তার প্রত্যক্ষ সমর্থনেই এরকম সীমাহীন নৈরাজ্য চলছে বাংলাদেশে। এখন অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে যে ভারতের সেভেন সিস্টার নিয়ে আর কোনো কথা বলছেন না। তিনি নিজে না বলে ভণ্ড ও উগ্র জঙ্গি মৌলবিদের দিয়ে বলাচ্ছেন। মৌলবিরাও মজহবি সমাবেশে ভারত আক্রমণের কথা বলতে একটু ভয় পাচ্ছে। আস্তে আস্তে মুখ ছোটো হয়ে আসছে তাদের। বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে হয়তো। হাওয়া লাগিয়ে যারা জেহাদিদের ওয়াজ মাহফিলে 'সাত আসমানে' তুলেছিলেন তাদের মধ্যে পাকিস্তানি ছাড়া এখন আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য আমেরিকা খেলা খেলছে দাবার গুটির মতো। ইরান সামলাতে গিয়ে তাদের লেজে-গোবর হতে হয়েছে।

সম্প্রতি ইউনুস সরকার মন রক্ষার জন্য ত্রিপুরায় তিনশো কেজি হাড়িভাঙ্গা আম পাঠিয়েছেন। এতে অতীত সৌহার্দ্য ধরার চেষ্টাও করে চলেছেন বলে সকলে অনুমান করছেন। কিন্তু এতে কী হবে, তাকে ভারত-সহ সারা বিশ্ব চিনে ফেলেছে আগেই। ইউনুস আখের গুছিয়েছেন এখন পালাই পালাই অবস্থা। তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে কেউ নাকি তাঁর কথা শুনছেন না। যদি তাই হয়ে থাকে তাকে সবাই বলবে তিনি নির্লজ্জ ও বেহায়া। □

ড. শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তথ্য বিভ্রাট

স্বস্তিকার শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা (৩০ জুন, ২০২৫) পড়লাম। তথ্যসমৃদ্ধ সংকলনটি স্বস্তিকার পাঠককুলকে, বিশেষকরে যুব পাঠককুলকে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে বলে মনে করি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম প্রায় কিছুই জানে না। এই সংখ্যাটি তাঁদের শ্যামাপ্রসাদ ও বাঙ্গালি হিন্দুর প্রতি তাঁর অবদান অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। এই সংখ্যায় অম্লানকুসুম ঘোষের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ড. শ্যামাপ্রসাদ' প্রবন্ধে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। শ্রীঘোষ লিখেছেন, 'সেই মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু আর অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং'। এখানে উল্লেখ্য যে, নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু সেই মন্ত্রীসভায় আদৌ ছিলেন না। তাঁর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করার কথা ছিল, কিন্তু ইংরেজ সরকারের পুলিশ মন্ত্রীসভা শপথ নেবার আগেই শরৎ বসুকে গ্রেপ্তার করে। ফলে মন্ত্রীত্বগ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই ত্রুটি সংশোধন করে নিলে সংকলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

—**বিনয়ভূষণ দাশ,**
গোলপার্ক, কলকাতা।

সামাজিক বৈষম্য

সামাজিক কর্মকাণ্ড আজ মানুষের জীবনকে আনন্দমুখর করে তোলে না। জীবনের সব সুখটুকু বর্তমানে ভোগসর্বস্ব সমাজ কেড়ে নিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য হয়তো কিছু লোকের বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সার্বিক উন্নতি আজও ঘটেনি। মানবিকতা আজ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সুকুমার বৃত্তিগুলি বিজ্ঞানের শুষ্ক কঠোর পরীক্ষানিরীক্ষার চাপে চুপসে গেছে। মানুষ আর মানুষের দুঃখে কাতর হয় না। প্রতিবেশী খেতে পেল কী পেল না, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না। চোখের সামনে মানুষ খুন হলে পুলিশের কাছে অপরাধীর পরিচয় গোপন রাখে। সমাজ ব্যবস্থা যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগে যারা অর্থের পাহাড় গড়তে চায়, এমন প্রাচুর্যের মধ্যেই ছোটো থেকে যারা মানুষ হয়েছে, তারা মানুষের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট বুঝবেই-বা কী করে। সোনার চামচ মুখে করে যে ছেলেটা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে ডাক্তার হলো, তার কাছে সমাজ অনেক আশা করলেও বাস্তবে কিছু পাওয়া যায় না। তারা আর যাইহোক সমাজমনস্ক বলে পরিচয় দিতে পারবেন না। দায়বদ্ধতা শব্দটা আজ সবার মধ্যে থেকে চলে যেতে বসেছে। কর্ম সংস্কৃতির জোয়ার এলে তো দেশ এগাবে? ধর্মবোধ তার বিবেককে পরিচালিত করলে তবে তো মহান হবে?

শিক্ষা ব্যবস্থাতে মূল্যবোধের কোনো ছোঁয়া নেই। নোটসর্বস্ব অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছাত্রদের ভোগমুখী জীবনের স্রোতে নিয়ে চলেছে। আদর্শ শিক্ষকের ত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। পুঁথিগত বিদ্যা জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে না। যারা পিছিয়ে পড়া সমাজে বসবাস করছে তারা বৃহত্তর সমাজ থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। তাদের আলাদা সংস্কৃতি ও পরিবেশ তাকে তার নিজস্ব গণ্ডি থেকে বের হতে দিচ্ছে না। যদিও মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শিক্ষিত হচ্ছে সেও তাদের সেই সংকীর্ণ মানসিকতার জন্য মাথা তুলতে পারছে না। সমাজকে নির্মাণ করতে সামাজিক দোষ-ত্রুটিগুলো মুক্ত করতে আর কেউ আগ্রহী ভূমিকা পালন করছে না।

—**দেবজ্যোতি পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদহ।

পেট্রাপোল স্থলবন্দরের নাম হোক শ্রীশ্রীহরিচাঁদ-গুরুচাঁদ স্থলবন্দর

সীমান্ত মহাকুমা বনগাঁ। এই বনগাঁতেই অবস্থিত সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর পেট্রাপোল স্থলবন্দর। দেশভাগের স্মৃতি বহন করে চলেছে পেট্রাপোল সীমান্ত। এই সীমান্ত ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। হাজার হাজার মানুষের রুটি রুজির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই স্থলবন্দর। বনগাঁ মহকুমায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের। বনগাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অংশের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর সময় ও কালকে অতিক্রম করে আজ মানুষের প্রাণপ্রিয় দেবতা হয়ে উঠেছেন। তাঁদের দর্শন ও কর্মকাণ্ড সমস্ত পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হিসেবেই চিহ্নিত। সাধারণ মানুষের আবেগকে সম্মান জানিয়ে বনগাঁ পেট্রাপোল স্থলবন্দরের নামকরণ হোক 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ স্থলবন্দর'। শুধুমাত্র মতুয়া সম্প্রদায়ের নয়, সারা পৃথিবীর বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত মানুষের মুক্তির নাম শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের নামে বনগাঁ পেট্রাপোল স্থলবন্দরের নামকরণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। আশা রাখি কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের অনুরোধকে বাস্তবায়িত করবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজরোড, বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা।

অভিভাবকরা কোন ভরসায় ছেলে-মেয়েদের কলেজে পাঠাবেন?

আরজি কর কাণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের

ফঃ ৩

গণধর্ষণ কাণ্ডের কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে কি? রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কি যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বা নিচ্ছে? কিন্তু আরজি কর কাণ্ডে পুলিশ সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছিল। মানুষের অভিযোগ ছিল, তথ্যপ্রমাণ লোপাটে পুলিশ সহযোগিতা করেছিল। সেই তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের গণধর্ষণ কাণ্ডে এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো অভিযোগ নেই। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। হঠাৎ কী এমন হলো যে, কসবা আইন কলেজের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে পুলিশ কোনো চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চাইছে না? একসময় কলকাতা পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনায় আসত। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, মুর্শিদাবাদে জেহাদি আক্রমণে গ্রামবাসীকে নিরাপত্তা দিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছিল। মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে আশ্চর্যজনকভাবে পিছু হটেছিল কলকাতা পুলিশ। বলাবাহুল্য যে, আইন কলেজের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এর আগেও বহু গুরুতর অপরাধ করেছে। পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও সে ছিল অধরা। শাসক দলের ছত্রছায়া তাকে আগলে রেখেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু ঠিক কী কারণে হঠাৎ সে শাসক দলের নেকনজরে পড়ে যায়, তা বোধগম্য নয়। আরজি কর কাণ্ডের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ঘটে গেল আইন কলেজের ঘটনা।

অপরাধ করা সত্ত্বেও যদি সামান্য কিছু কারসাজিতে শাস্তিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় তবে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে 'ভিখু' চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নিষ্ঠুরতায় ও বর্বরতায় মনোজিৎ মিশ্র 'ভিখু' চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। এরাজ্যে তৃণমূল আশ্রিত অপরাধীরা শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কৃত হয়, যা দেখে অন্য অপরাধীরা উৎসাহিত হয়। তারা জানে এ সরকার তাদের। শাসক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখার সুবাদে যে যা খুশি করতে পারে, তা দেখিয়ে দিল কসবা আইন কলেজের ঘটনা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি যেভাবে বাড়ছে তাতে আশঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই আইন কলেজের ঘটনা বিন্দুমাত্র জলে আকাশ দর্শনের মতো কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এরকম ছোটো-বড়ো মনোজিৎ মিশ্র আরও কত যে আছে, তা ভাবলে শিহরিত হতে হয়। এরপর অভিভাবকরা কোন ভরসায় ছেলে- মেয়েদের কলেজে পাঠাবেন, তা নিয়ে রয়েছে এক বিরাট প্রশ্ন।

—**অজয় ভট্টাচার্য,**
বনগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে নিকট ভবিষ্যৎ না সুদূর ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ এমন একটি শব্দ, যা কেউ জানে না। তবে বর্তমান কর্মকাণ্ডের আলোকে ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন, মানুষ তাঁর আদি ও অন্ত (ভবিষ্যৎ) জানে না, শুধু বর্তমান বা মধ্যটা জানে। যদিও এর অর্থ ব্যাপক। ক্ষুদ্র অর্থে এটি হচ্ছে, মানুষ তাঁর ভবিষ্যৎ জানে না। নিকট ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারে, সুদূর ভবিষ্যৎ কল্পনা মাত্র। প্রকৃতি তা নির্ধারণ করে। আমার সমাজ মাধ্যমে একজন মন্তব্য করেছেন যে, চারশো বছর আগে বঙ্গপ্রদেশে কোনো মুসলমান ছিল না, সুদূর ভবিষ্যতে কী হবে তা কি কেউ বলতে পারে? আজকের প্রেক্ষাপটে এটুকু বলা যায়, বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আশার আলো কি নেই? আছে, চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু সেই আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বলা হয়, অন্ধকার যত ঘনীভূত হয়, দিনের আলো ততই সন্নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। 'ভয় নেই, জাগো বাহে...।' একটা সময় ছিল যখন হিন্দুদের গন্তব্য ভারত ছিল। এটি আমার জীবনে ঘটেছে। পাকিস্তান আমলের একেবারে শেষদিকে এসএসসি/এইচএসি-তে ভালো রেজাল্ট করলে সবাই বলাবলি করতে থাকলো যে, আমি ডাক্তারি পড়বো (যদিও আমি ভাবিনি)। এতে জল ঢেলে দেন আমার বাবা। তিনি বলেন, এতদিন পাকিস্তানে থাকতে পারবে না। এর দেড়-দুই বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। অর্থাৎ আমার বাবাও ভবিষ্যৎ জানতেন না। কেউ জানত না, কিছু লোক হয়তো জানত।

এ সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত, অসহায়। তাঁদের পাশে কেউ নেই। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, দুই কোটি হিন্দু হারিয়ে যাবে। বিশেষত এই ইন্টারনেটের যুগে সেটি অসম্ভব। সাত দশক আগে পাকিস্তান পেরেছিল প্রায় পুরো হিন্দু জনগোষ্ঠীকে মেরেকেটে ভাগিয়ে দিতে। কারণ মানুষ জানতো না কী হচ্ছে সেখানে। এখন সবাই সবকিছু জানে। মুহূর্তে বিশ্বের কাছে পৌঁছে যায় বাংলাদেশে হিন্দু বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর। বর্তমান পুরো বিশ্বে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশি হিন্দু-বৌদ্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁরা সবাই সোচ্চার। সুতরাং ভয় নেই। আপনি হয়তো ভাবছেন, কিচ্ছু হবে না। হবে, ধৈর্য ধরুন। কোথা দিয়ে কী হবে আমি জানি না, শুধু এটুকু জানি, প্রকৃতি সবকিছু সুদে-আসলে আদায় করে নেবে।

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অবমাননা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এক দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। হেলেনের জন্যে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। কে জানে কোনো 'সাবিত্রী'র জন্যে বাংলাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। এর মানে কি আপনি চুপ করে বসে থাকবেন, যা হবার প্রকৃতি করবে? না, দেশে-বিদেশে হিন্দুরা এখন আর বসে নেই, যে যার মতো কাজ শুরু করেছে। হয়তো সেসব অপ্রকাশ্য। কিছুই ফেলনা নয়। 'বিন্দু বিন্দু জল' একদিন হয়তো সিন্ধুর রূপ নিতেও পারে। কে জানে হিন্দুদের মধ্যে থেকে একজন সুভাষচন্দ্র বসু হবে না? সূর্য সেন বা প্রীতিলতা জন্ম নেবে না? তাই হিন্দুদের উঠে দাঁড়াতে হবে। ভয়কে জয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

—**শিতাংশু গুহ,** নিউ ইয়র্ক।

মায়ের আঁচল

মৌ চৌধুরী

জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কী? এর উত্তর হয়তো অনেকগুলি হবে। অনেকেই বলবেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থ, সুচিকিৎসা, গাড়ি এইসবই মানুষের প্রকারভেদে মূল প্রয়োজন। এসব ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না কি? সবাই এই কথা বলবেন বিভিন্নভাবে। প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি তাই?

এই প্রশ্নের উত্তর জগজ্জননী মা-সারদা আগেই বলে গিয়েছেন। তিনি যে অভয় বাণী রেখে গেছেন— 'আমি সকলের মা'। সকল কথা, সকল উত্তর মায়ের এই অমূল্য বাণীর মাঝেই নিহিত। তাঁর অন্তর নিঃসৃত স্নেহ, আশীর্বাদের উপর ভরসা করে অনেকটা পথ চলতে পারি। মায়ের স্নেহের আঁচল প্রতিটি মানুষের হৃদয়-মন শান্তির ও মমতার বারিধারায় পরিপূর্ণ। মায়ের প্রতিটি উপদেশ, মায়ের আদর্শ আজ ঘরে ঘরে পালিত হোক। মায়ের বাণী নারীজাতির আদর্শ হয়ে উঠুক। শ্রীমায়ের দেখানো পথ শুধু গৃহশান্তি নয়, মানবজীবনের সর্বস্তরে পরিবর্তন বয়ে আনবে। স্বামী ত্রিগুণানন্দজীর কথায়, কেবলমাত্র দেবতার সামনে আসনে বসে ত্রিসন্ধ্যা জপ-ধ্যান আর ধূপ-বাতি দেখালেই জীবনের প্রশান্তি আসে না। তাকে স্মরণ ও মনন করে হৃদয় আলোকিত করতে হয়। অন্তরে প্রশান্তি আনতে গেলে শ্রীমা যে শক্তি, ধৈর্য, দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতার দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে রেখে গিয়েছেন তাকে অনুসরণ করতে হবে।

আজকের তথাকথিত আধুনিক সমাজে পদে পদে যে নারী লাঞ্ছনার চিত্র, নারীদের উগ্রতার যে ছবি উঠে আসছে তাতে মানুষ হিসেবে লজ্জার সীমা পরিসীমা নেই। এক শ্রেণীর 'সুশিক্ষিত' বলে পরিচিত কিশোর থেকে প্রৌঢ় শ্রেণীর পুরুষের লালসা কামনার আগুনে সমাজ সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে তারা, 'মানুষ' হিসেবে বড়োই বেমানান।

মা-সারদা একজন সন্তানেরও জন্ম না দিয়ে শত শত সন্তানের মা হয়ে পূজিতা হচ্ছেন। সেই সময়ের অসংখ্য কৃতী সন্তান দৃষ্টান্তমূলক ভালো কাজ করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কামনা-বাসনাকে জয় করে মানুষের সেবায় নিজেদের সমর্পণ করেছেন। ঠাকুর ও মায়ের অসংখ্য ভক্ত অকাতরে মানবসেবায় নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছেন। শ্রীমা নিজের আঁচল পেতে তাদের স্নেহ ভালোবাসায় একাত্ম করে সংযত হবার মানসিক শান্তি প্রদান করে গেছেন। মায়ের অবদান সেবা সর্বোপরি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সন্তানদের সৎ উপদেশ সংযম, সহ্য, ধৈর্য সম্পর্কে বাল্যকাল থেকে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করে দেওয়া। যারা সুস্থ সমাজ গঠন করবে। আমরা সারদা দেবীর জীবনের শুরু থেকে আরম্ভ করে শেষদিন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, তিনি কতটা আধুনিকমনস্ক, উদার ও শিক্ষিতা ছিলেন। তাই যে আলো তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন তারই প্রতিফলনে সমাজ এতটা এগিয়েছে।

বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সমাজের বড়ো একটা অংশ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে বলে সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। তাঁদের মতে এই ক্ষয়িষ্ণু যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে নারীদের শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। মা-সারদার আঁচলের ছায়ায় তাঁর দেখানো পথ প্রতিটি নারীর নিত্য স্মরণ সরণি হওয়া দরকার। সমস্ত নারী মা সারদার ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্তান লালন-পালন করলে, সত্য নিষ্ঠার শিক্ষা দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ তাদের ওপরেও আসবে। প্রকৃত মানুষ হওয়ার মূল্য প্রাপ্তি ঘটবে জীবনে। এই কাজের দায়িত্ব অনেকটাই মায়েদের উপরই নির্ভর করছে।

ব্রেন ড্যামেজ : প্রতিকারের উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

'ব্রেন রট' শব্দের ব্যবহার কিন্তু আজকের নয়। এটি অনেক দিনের পুরানো। শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এই মস্তিষ্কের অলসতা অনেকদিনই গ্রাস করেছে আমাদের। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বলেছেন, 'আমরা অনেক সময়েই বিভিন্ন বিষয়ে ডিক্লাইন্ড থিয়োরিতে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ আগে সব ভালো ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে। এইভাবে ডিনায়ালে থাকাটা কিন্তু ঠিক নয়। এটা মানতেই হবে, আমরা নিজেরাই এখন এমন অনেক কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যা থেকে পিছনে ফেরা সম্ভব নয়। ইন্টারনেটের ব্যবহারটাও সেরকমই। সুফল থাকার পাশাপাশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মুখোমুখিও হতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি মনে করিয়ে দিলেন, কোচিং ক্লাস মানে বই বা নোটসের কথা, যেখানে অনেক সময়েই শিক্ষার্থীকে গুলে খাইয়ে দেওয়া হয়। তার নিজস্ব চিন্তাশক্তি বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

'ব্রেন রট্' বরাবরই ছিল, তা ছিল অন্যরূপে। এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে তা আমাদের জীবনকে এতটা গ্রাস করেছে বলে বেশি করে আমাদের নিষ্কর্মা হয়ে পড়াটা চোখে পড়ছে। ওটিপি দিয়েই জীবনের সব প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে, মাথা খাটানোর দরকার কমে আসছে'— বললেন তিনি।

অলস মস্তিষ্ক সব সময়েই খুঁজে নিতে চায় তাৎক্ষণিক সুখ। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ রিমা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'অনলাইন কনটেন্ট আমাদের মস্তিষ্ককে গভীর ভাবে চিন্তা করতে বাধা দেয়। অনলাইন শপিং, অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দের খাবার কিংবা পোশাকটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবার মধ্যে যে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি রয়েছে, সেটা কিন্তু আদতে ভয়ংকর। পরদিনই হয় তো মনে হচ্ছে, ওই পোশাকটা আমার দরকার ছিল না, অথচ কিনতে ইচ্ছে করছিল বলেই কিনে ফেলেছি। আবার যদি কেউ ইউটিউব দেখে কোনো রান্না শেখেন কিংবা গিটার প্র্যাকটিস করেন অথবা উল বুনতে শেখেন তখন তাকে আর ব্রেন রটের পর্যায়ে কিন্তু ফেলা যাবে না। অর্থাৎ আমরা কী দেখছি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ গড়ার সময় : এই আলোচনা বিশেষ করে ছোটোদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে রয়েছে যে শিশু, তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে এটি। কোভিড পরবর্তী সময়ে শিশুদের হাতে হয়তো মোবাইল দিতেই হয়েছে, অনলাইন ক্লাস করার জন্য। তবে সেই গ্যাজেটে যদি আটকে পড়ে শিশুটি, তাহলে তার বেসিক সোশ্যাল স্কিলগুলোই তৈরি হবে না।

যে বয়সে কথা বলা শেখার কথা, আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে খেলা, ভাব, আড়ি ইত্যাদি নিয়ে থাকার কথা, সে যদি হাতে একটা ফোন পেয়ে যায়, বাড়ি থেকে বেরোনোর ইচ্ছেটাই তৈরি হবে না। কমিউনিকেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশানে ঘাটতি পড়ে যাওয়া পরোক্ষে প্রভাবিত করবে তার পড়াশোনাকেও। একটানা মন দিয়ে কোনো কিছুর করার অভ্যাস তৈরিই হবে না। কল্পনাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। 'অনলাইন গেমে সে বেশিরভাগ সময়ে নিজের জয়-পরাজয় নিয়ন্ত্রণ করছে। খেলার মাঠে যে হারতেও হয়, দল বেঁধে খেলার যে মজা এগুলো কিছুই সে জানবে না', বললেন চিকিৎসক রিমা মুখোপাধ্যায়।

অভিভাবকের ভূমিকা : অঞ্জন দত্ত যেমন বলেছিলেন 'টিভি দেখো না', সেটা একটু বদলে নিয়ে মা-বাবার সন্তানদের আজকাল বলছেন, 'ফোন দেখো না'। কিন্তু নিজেরা অবসর সময়ে সেই শিশুকে মুঠোফোনের বিকল্প হিসেবে এমন কিছু দিতে হবে, যা তাকে আকর্ষণ করবে। বিকেলে বা ছুটির দিনে ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলে কিংবা কোনো খেলাধুলায় তাকে যুক্ত করলে আপনা থেকেই তার অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। ফোন বা টিভির সামনে বসিয়ে দেওয়াটা ব্যস্ত মা-বাবার পক্ষে সহজতর অপশন হলেও তা সন্তানের পক্ষে ভালো নয়। বেড়াতে গেলে ট্রেন, বাসের বাইরেটা দেখতে দেখতে যাওয়া মুগ্ধতা যদি রিলস্ দেখায় বা সেলফি তোলায় সীমিত হয়ে পড়ে, তাহলে মুশকিল। মনে রাখতে হবে, সন্তানকে সারাক্ষণ বিনোদন জুগিয়ে চলা মা-বাবার দায়িত্ব নয়। ছোটোদের জিজ্ঞাসু মনকে নিজের মতো করে বিকশিত হতে দিন।

সন্তানকে আগলে চলার পাশাপাশি অভিভাবকের নিজেদের দিকেও তাকানো দরকার। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করা দ্বিগুণ কঠিন। 'সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে যে ফিডগুলি আসে, আমাদের যা দেখাতে চাওয়া হচ্ছে তাই গিলছি আমরা। সত্যি তো এখন 'ক্রিয়েট' করা যায়। আমরা আজকাল ঝগড়া করি না। কারণ কথাবার্তাই কমে এসেছে। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই একাকিত্ব, অবসাদ বাড়ছে।'

তবে উপায়? মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিমা মুখোপাধ্যায় জানালেন, অনলাইন কনটেন্টের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির সমস্যা নিয়ে যারা তাঁর কাছে আসেন, তাদের চিকিৎসা করার আগে প্রথমেই কারণ খোঁজা হয়। অর্থাৎ কেন এই আসক্তি? 'সকলের ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাডিকশনের কারণ এক নয়। কারও কাছে এটা একটা এসকেপ রুট। পরিশ্রম সাধ্য। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে চায় না বলে এই সহজ রাস্তাটা সে বেছে নিয়েছে। আবার কারও একাকিত্ব কাটানোর প্রয়োজন মেটাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া চ্যাট। যাদের মনসংযোগ করায় সমস্যা রয়েছে, তারা অনেক সময়েই লঘু জিনিসপত্রে মন দিয়ে সময় নষ্ট করে। এভাবে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে তারপরে সেই মতো তাদের গাইড করার চেষ্টা করি আমরা।'

তবে ব্রেন রট যে সব সময়ে দুর্গন্ধযুক্ত নয়, সে কথাও মনে করিয়ে দিলেন। টেকনোলজির যে শুধুই কুফল রয়েছে তা তো নয়। তবে টেকনোলজি না জানলেই আপনি 'আনস্মার্ট' বলে যে ধারণাটা চাউর করা হয়েছে, সেই ফাঁদে পা না দিলেই হলো। স্মার্ট ফোন শব্দটার মধ্যেই তো সেই ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের সুফলটা নিয়ে বাকিটা বর্জন করতে জানতে হবে। একটা ক্রমাগত অভ্যেস তৈরি করতে হবে নিজেদের, সন্তানদেরও।'

অর্থাৎ কোনো আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স নয়, রাশ রাখতে হবে নিজেদের হাতে। সে রাশ আলগা হতে দেওয়া যাবে না। তাহলেই মাথায়, মনে চেপে বসবে অদৃশ্য শত্রু। অজান্তেই নিয়ন্ত্রণ করবে মন, মাথাকে।

পশ্চিমবঙ্গের গরিব, অনগ্রসর হিন্দুসমাজের উপর হওয়া অবিচার বন্ধ করার সময় এসেছে

সুদীপ্ত গুহ

'ওবিসি' শব্দটির অর্থ হলো--- আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। গরিব, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষাগ্রহণ এবং সরকারি চাকরির সুবিধার জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার চালু করে ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ। আসমুদ্রহিমাচলে ওবিসি সংরক্ষণ চালু হলেও বাদ থাকে শুধু দু'টি রাজ্য। জম্মু-কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন, তার ১৩ বছরের শাসনকালে রাজ্যের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে এই রাজ্যে কেউ ওবিসি নেই। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত ১৫০টি শ্রেণীর মানুষ বঞ্চিত হয় উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি চাকরি পাওয়া থেকে। যার মধ্যে মাহিষ্য, সদগোপ, তিলি, বণিক শ্রেণীর বড়ো অংশ রয়েছেন। জ্যোতি বসু সেই সময় 'সেন কমিশন' নামে একটি কমিশন বসান। তারা শুনানির দ্বারা সাক্ষ্যগ্রহণ করে উপরোক্ত সমাজের বামপন্থী নেতা-কর্মীদের থেকে এবং কলকাতায় বসবাসকারী ওই সমাজের মাথাদের থেকে যারা বামেদের বন্ধু হয়ে কলকাতায় বসে চাকরি করতেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায় বড়ো সুবিধা নিতেন। এই দুই পক্ষই দাবি করেন তাদের কোনো সমস্যা নেই এবং তাদের কোনোরকম সংরক্ষণ প্রয়োজন নেই। তৎকালীন সংবাদমাধ্যমের সিংহভাগ বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় এই গভীর চক্রান্তের খবর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বৃহত্তর মাহিষ্য, কৈবর্ত, সদগোপ, বণিক, তিলি সমাজের মানুষ জানতে পারেনি, যাদের প্রতি প্রতিদিন অন্যায় ও অবিচার চলছিল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের নামে মাহিষ্যদের জমি কেড়ে নেয় বামপন্থী মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা ভূমি সংস্কার মন্ত্রী ছিলেন আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। ফলে এই পর্যায়ে শুরু হয় মুসলমানদের নামে ভূমি সংস্কার হওয়া জমিগুলির মিউটেশন। রেজ্জাক মোল্লা তার অধীনস্থ দপ্তরের প্রতিটি ব্লক অফিসে নিজের লোক বসান। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গে হওয়া ভূমি সংস্কারের দরুন এসসি-এসটি (তপশিলি জাতি ও উপজাতি)-দের একটি অংশও কিছুটা উপকৃত হয়। কিন্তু তাঁরা মুসলমানদের মতো জমির মালিক হতে পারেননি। গ্রামের জমি হাতছাড়া হওয়ার পর মাহিষ্যরা কৃষি বিষয়ক অন্যান্য ব্যবসাও হারাতে থাকে। চালকল, গমকল, হিমঘর, লজিস্টিক্স, রিটেল-সমেত পুরো সাপ্লাই চেন থেকে তাঁরা বেরিয়ে যান। একই অবস্থা হয় তিলি, তাঁতি, সদগোপ ও বণিকদের। তেলের ব্যবসা, গোপালন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যবসা, পশুপালন, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি সব ব্যবসা থেকেই তাঁরা দূরে সরে যেতে থাকেন। বামফ্রন্ট সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী হন আনিসুর রহমান। সরকারি সুযোগসুবিধার আওতার বাইরে চলে যেতে থাকে হিন্দু বাঙ্গালিরা।

তাঁদের পরিবর্তে সাপ্লাই চেনে মুসলমানরা ঢুকে পড়ায় কীভাবে বাঙ্গালি হিন্দুদের একের পর এক ব্যবসা ছাড়তে হয় সেটারও আলোচনা প্রয়োজন। প্রতি শুক্রবার নমাজের পর যে বক্তৃতা হয়, সেখানে এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের শেখানো হয়, 'নিবা, কিন্তু দিবা না'। অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা নেবে, কিন্তু বিনিময়ে পয়সা দেবে না। এবার ধরা যাক মাছের ব্যবসা। কোনো হিন্দু মাছের জাল, ওষুধ, হরমোন বা নৌকা (মৎস্য পরিবহণ), রেফ্রিজারেটর বা রিটেল বিক্রির ব্যবসা করে। কোনো একজন ক্রেতা যদি জিনিসপত্র নিয়ে পয়সা না দেয়, তবে বিক্রেতা ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যাবে। ব্যবসার পুঁজি, ব্যাংক ঋণ ইত্যাদি কীভাবে তিনি শোধ করবেন? অথচ এই তথাকথিত সংখ্যালঘুরা নিজেদের মধ্যে এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে না। এমনকী, ব্যাংক ঋণ শোধ করতে না পারলে এদের সম্প্রদায় সেটা শোধ করার ব্যবস্থা

করে। এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে বলে রিপোর্ট দাখিল করে সাচার কমিটি। এই রিপোর্ট পুরোপুরি মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কেন্দ্রের চাপে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ১৯৯৭ সালের ৬ নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুসলমানদের ১১টি এবং অ-মুসলমানদের ৫৫টি অর্থাৎ মোট ৬৬টি সম্প্রদায়কে 'অনগ্রসর' হিসেবে চিহ্নিত করে এই রাজ্য। কিন্তু বিরাট সংখ্যক গরিব হিন্দুদের কাছে ওবিসি শংসাপত্র থেকে যায় অধরা। জ্যোতি বসু জমানার এই সামাজিক অন্যায় আরও বাড়ালেন জ্যোতি বসুর উত্তরসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ আসনে বামফ্রন্ট হেরে যাওয়ার পর মুসলমান ভোটব্যাংক ফিরিয়ে আনতে ২০১০ সালে ওবিসি সংরক্ষণের সীমা ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশে নিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের নজির সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকার। কারণ ৭৭টির মধ্যে ৭৫টি সম্প্রদায়ই ছিল মুসলমান। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০১০ সালেই নতুন ওবিসি স্ট্যাটাস পায় ৪২টি মুসলমান সম্প্রদায়। ওবিসি সংরক্ষণকে সচতুরভাবে ওবিসি—এ ও বি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বাম সরকার। অতি পিছড়ে বর্গ বা অধিক মাত্রায় অনগ্রসর শ্রেণীটির পরিচয় হয় 'ওবিসি-এ'। এর সংরক্ষণ সীমা ছিল ১০ শতাংশ। কোনো অ-মুসলমান সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অর্থাৎ মোট ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে ১০ শতাংশ শুধুমাত্র বরাদ্দ ছিল মুসলমানদের জন্য। 'ওবিসি বি'-র সংরক্ষণ সীমা ছিল ৭ শতাংশ। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিল তার অন্তর্গত। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের পরিবর্তে ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করে বামফ্রন্ট। বাকি ১০ শতাংশ তারা রেখে দেয় ভবিষ্যৎ রাজনীতির লাভের গুড় খাওয়ার জন্য। কিন্তু বামেদের পক্ষ থেকে এতরকমের পদক্ষেপ সত্ত্বেও ২০০৬ সালে প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্ট বিশ্বাস করে মুসলমানরা। ভোটে হেরে যায় বামফ্রন্ট। ২০১১ সালে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয় তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট। মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর নিজের ভোটব্যাংক ধরে রাখতে ওবিসি-এ'র পাশাপাশি ওবিসি'বি-তেও ৯৯ শতাংশ মুসলমানের নাম তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩-এর ২৩ নভেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীয় সভায় একথা তিনি গর্বের সঙ্গে ঘোষণাও করেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, মাহিষ্যদের জন্য কোটা দেবে। কিন্তু মুসলমান ভোটের কথা ভেবে ভোটের পর আবার চুপ করে যায়। ২০১০ সালের পর থেকে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের গরিব এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর হিন্দুসমাজ। পরিণামে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় একের পর এক জনস্বার্থ মামলা। সেই আবেদনগুলির শুনানির শেষে গত বছর ২২ মে, ২০১০ সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে প্রণীত ওবিসি সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং ৭৭টি অনগ্রসর সম্প্রদায় নির্বাচন-সহ ওবিসি শ্রেণীবিভাগের গোটা প্রক্রিয়াটিকেই বাতিল ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়ে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান শিডিউলড ক্লাস্টস্ অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস্) (রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকেন্সিজ ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্টস্) অ্যাক্ট, ২০১২' অনুযায়ী ৩৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনার প্রক্রিয়াটিও খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ২০১০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট অবৈধ বলে ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলায় হেরে যাওয়ার পর সেই রায় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করে রাজ্য। গত বছর ৯ ডিসেম্বর সেই মামলার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই ও কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ধর্মের ভিত্তিতে কোনো সংরক্ষণ দেওয়া যায় না। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওবিসি শ্রেণীবিভাগের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট। তাদের পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট বলে যে, সংরক্ষণ ঘোষণার ক্ষেত্রে ধর্মই হয়ে উঠেছে একমাত্র মানদণ্ড। ৭৫টি সম্প্রদায়ের মুসলমানদের 'অনগ্রসর' বা 'পিছিয়ে পড়া শ্রেণী' হিসেবে নির্বাচন করার বিষয়টি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যও বিশেষ অপমানজনক। এর মধ্যে রাজ্যে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সংকট। ওবিসি সংরক্ষিত আসনে ভর্তির ক্ষেত্রে তৈরি হয় গোলযোগ। গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঝুলে থাকায় উচ্চশিক্ষায় ওবিসি আসন সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না বলে অজুহাত দেয় রাজ্য সরকার। গত ১৮ মার্চের শুনানিতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানায় যে, অনগ্রসর শ্রেণী চিহ্নিতকরণের জন্য তারা একটি নতুন সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে সেই সমীক্ষা। এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে ফের একটি ভুলে ভরা সমীক্ষা শুরু করে রাজ্য জুড়ে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছিল যে, বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে একটি শ্রেণীকে 'অনগ্রসর' ঘোষণার প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে কোনো সম্প্রদায় বা শ্রেণী 'অনগ্রসর' হিসেবে ঘোষিত হতে পারে না। কেন্দ্র ও রাজ্যের অধীনস্থ সরকারি চাকরিক্ষেত্রে শ্রেণীটির যোগদান বা প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত হলে সেই বিষয়টি শ্রেণীটিকে ওবিসি হিসেবে ঘোষণার একটি ভিত্তি হতে পারে। অন্যান্য অসংরক্ষিত শ্রেণী-সহ সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্বের অপ্রতুলতার মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের রাস্তায় না হেঁটে মুসলমান ভোটব্যাংক ও তুষ্টীকরণের রাজনীতিতে পটু তৃণমূল সরকার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কায়দায় একটি মনগড়া সমীক্ষা শুরু করে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় ওবিসি হিসেবে নাম তোলার জন্য মুসলমানরা যেসব ফর্ম পূরণ করছে, সেখানে তাদের যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ তারা করছে, সেই সম্প্রদায়গুলির নাম আগে কোনোদিন শোনাই যায়নি। এই সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও তাদের সরকারের দেওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট বৈধ বলে আদালতে প্রমাণ করার চেষ্টায় মরিয়া রাজ্যের শাসক দল এবং তাদের নেত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণে বঞ্চিতদের পক্ষ থেকে দায়ের করা একটি মামলায় গত ২২ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করে কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার কারণে এই সমস্যা বলে হাইকোর্টকে জানায় রাজ্য। বিচারপতি কৌশিক চন্দ তাঁর দেওয়া রায়ে বলেন যে, ২০২৪-এ কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের উপর কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। অতএব, রাজ্যের দেওয়া অজুহাত কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। ২০১০ সাল থেকে রাজ্য প্রণীত ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল বলে ঘোষণা করেছে

> **১৯৯৭ সালে রাজ্যে ২০ শতাংশ অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় ২০২৫ সালে এসে কীভাবে প্রায় ৯০ শতাংশে পরিণত হলো? এই পরিসংখ্যান কি প্রমাণ করে না যে বামফ্রন্ট এবং তৃণমূলের শাসনে নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছে এই রাজ্যের মুসলমানেরা?**

হাইকোর্ট। ২০১০ সাল থেকে রাজ্য সরকারের ইস্যু করা ওবিসি সার্টিফিকেটগুলিতে সার্টিফিকেট প্রাপকের কাস্ট (জাতি বা সম্প্রদায়)-এর উল্লেখ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা যে জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়টির উল্লেখ ২০১০-এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত বা স্বীকৃত 'ওবিসি তালিকা'য় যদি থাকে, তাহলে তাঁদের ওবিসি হিসেবে গণ্য করা যেতেই পারে এবং ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষিত আসনে তাঁরা ভর্তি হতে পারেন।

এমতাবস্থায় তাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে, মনগড়া সমীক্ষা শেষে গত ৩ জুন তাদের নতুন ওবিসি সংরক্ষণ নীতি ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৯৭ সালের ৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের বিপ্রতীপে '1106-BCW/MR-33/2025, Dated June 3, 2025'-শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফের ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ সীমা ঘোষণা করে রাজ্য। ফের তৈরি করা হলো দুটি শ্রেণী— ১০ শতাংশ সংরক্ষণ সীমাসম্পন্ন ক্যাটিগরি-এ (মোর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস) এবং ৭ শতাংশ সংরক্ষণ সীমার ক্যাটিগরি-বি (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস)। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুসলমান তোষণের নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্যে ওবিসি-র অর্থ 'আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস' থেকে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ওয়ান-সাইডেড বেনিফিশিয়ারি ক্লাসেস'। গত ১০ জুন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের 'পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন'-এর বার্ষিক রিপোর্ট রাজ্য বিধানসভায় পেশ করার সময় তার দেওয়া বক্তৃতায় ধর্মের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে কোনো সংরক্ষণ দেওয়া হয় না বলে এক অলীক দাবি করে বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য যে, অনৃতভাষণ তা বলাই বাহুল্য। ২০১০ সালের আগের রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ওবিসি সংরক্ষণ নীতি এবং গত ৩ জুন রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ওবিসি সংরক্ষণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নীচে উপস্থাপন করা হলো।

২০১০ পূর্ববর্তী পরিস্থিতি :

মোট ওবিসি সম্প্রদায় : ৬৬

মুসলমান সম্প্রদায় : ১১

অ-মুসলমান সম্প্রদায় : ৫৫

মুসলমান সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ প্রাপ্তির পরিমাণ : ২০ শতাংশ

২০২৫ সালে তৃণমূল সরকারের অধীনে অন্তর্ভুক্ত ওবিসি সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান :

পার্ট ১ (ক্যাটিগরি-এ) :

মোট ওবিসি সম্প্রদায় : ৫১

মুসলমান সম্প্রদায় : ৪৬

অ-মুসলমান সম্প্রদায় : ৫

মুসলমান সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ প্রাপ্তির পরিমাণ : ৯০ শতাংশ

পার্ট ২ (ক্যাটিগরি-বি) :

মোট ওবিসি সম্প্রদায় : ২৫

মুসলমান সম্প্রদায় : ২১

অ-মুসলমান সম্প্রদায় : ৪

মুসলমান সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ প্রাপ্তির পরিমাণ : ৮৪ শতাংশ

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের প্রায় পুরো ফয়দা পাবে মুসলমানেরাই। বার বার এই একতরফা সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়নের ফলে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সরকারের দিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নচিহ্ন উঠে আসে। প্রশ্নটি হলো, ১৯৯৭ সালে রাজ্যে ২০ শতাংশ অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় ২০২৫ সালে এসে কীভাবে প্রায় ৯০ শতাংশে পরিণত হলো? এই পরিসংখ্যান কি প্রমাণ করে না যে বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের শাসনে নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছে এই রাজ্যের মুসলমানেরা? নাকি হিন্দুদের বঞ্চিত করতেই দুধেল গাইদের জন্য পরিকল্পিতভাবে এই পক্ষপাতদুষ্ট সংরক্ষণ? কয়েকদিন আগেই এই ধরনের সংরক্ষণ নীতিকে খারিজ করেছিল বিচারবিভাগ। ফের সেই এক নীতি ঘোষণা করে রীতিমতো আদালত অবমাননার নজির সৃষ্টি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রাজ্যের জারি করা নতুন তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে পুনরায় মামলা দায়ের হয়। গত ১৭ জুন এই বিজ্ঞপ্তি ও তালিকায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ বলে যে, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের করা আবেদনের শুনানি এখনও চলছে। সেই মামলায় এখনও রায়দান করেনি সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের রায়ে ২০১২ সালের রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ পদ্ধতি আগেই বাতিল ঘোষিত হয়েছে। সেই আইনে সংশোধন করে নতুন ওবিসি তালিকা কেন প্রকাশ করা হলো জানতে চায় হাইকোর্ট। এছাড়াও নতুনভাবে ওবিসি সংরক্ষণ ঘোষণার ক্ষেত্রে ২০১২-র আইনটিকে অর্ধেক ব্যবহারের পাশাপাশি 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট, ১৯৯৩'-আইনটিকেও এক্ষেত্রে ব্যবহার করার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা রাজ্যের কাছে চায় হাইকোর্ট। প্রায় ১৪০টি সম্প্রদায়ের আর্থিক সঙ্গতি-সহ নানা মাপকাঠি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ রাজ্যের দাবি অনুযায়ী মাত্র দেড় মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে হাইকোর্ট। এই বিষয়ে একটি সঠিক, যথাযথ ও বিশদ সমীক্ষার উপরেও জোর দেন বিচারপতিরা। রাজ্যের তৈরি নতুন ওবিসি তালিকায় বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নাম অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে অনলাইনে জাতিগত শংসাপত্র (ওবিসি সার্টিফিকেট) জমা দেওয়ার জন্য সম্প্রতি একটি পোর্টাল খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই পোর্টালের ক্ষেত্রেও এদিন স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আদালতে একের পর এক মামলা হেরে যাওয়া রাজ্য সরকার বহু বছর ধরেই ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাহিষ্য, কৈবর্ত, সদগোপ, তিলি, বণিকদের বাদ দিচ্ছে। পরিকল্পনামাফিক প্রায় ৩৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে তাঁদের বঞ্চিত করা চলছে। ▮

বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে জাতীয় ছাত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ১০ জুলাই মানিকতলা সুকিয়া স্ট্রিটস্থিত রামমোহন লাইব্রেরিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস, জাতীয় ছাত্র দিবস এবং বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক যশবন্তরাও কেলকরের জন্ম শতবর্ষ পূর্তিতে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, পরিষদের ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল, প্রদেশ সভাপতি ড. পবিত্র দেবনাথ-সহ অন্যান্য কার্যকর্তা, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী।

মঞ্চাসীন অতিথিগণ মা সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। পরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কলকাতা মহানগর সভাপতি ড. অসিতবরণ বিশ্বাস। শ্রীবিশ্বাস তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষদের আপ্তবাক্য 'শিক্ষা চরিত্র একতা' শব্দগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এর পর বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক যশবন্তরাও কেলকরের জীবনীর প্রাসঙ্গিকতা সকলের সামনে তুলে ধরেন সভার প্রধান বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। তিনি বলেন, বিদ্যার্থী পরিষদকে বুঝতে হলে শ্রীকেলকরকে বুঝতে হবে এবং শ্রীকেলকরকে বুঝতে হলে বিদ্যার্থী পরিষদকে বুঝতে হবে। একে অপরের প্রতিবিম্ব। তিনি সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন আবার অধ্যাপকও ছিলেন। অরাজনৈতিক ও অনুশাসিত ছাত্র সংগঠন রূপে তিনি বিদ্যার্থী পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদের কার্যপদ্ধতি, কার্যকর্তার আচরণ, বাকি সংগঠনের থেকে পৃথক পরিষদের কাজকে তিনি তাঁর সংস্কারিত ও অনুশাসনপ্রিয় জীবনের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের সামনে আদর্শ রূপে তুলে ধরেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে তৈরি হওয়া কার্যকর্তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে নেতৃত্ব করছেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে এই কাজকে আরও গতিশীল করতে হবে, তাতেই এই সভার সাফল্য। উপস্থিত বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও তিনি করেন। সভার শেষলগ্নে দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সম্পাদক অনিরুদ্ধ সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমবেত 'বন্দেমাতরম্' গানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। ৯ জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে পরিষদ সদস্য সংগ্রহ এবং পুনর্নবীকরণের কাজ শুরু হয়। এদিন সভার পরে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং বর্তমান সদস্যরা তাঁদের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করেন।

বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ সমিতির উদ্যোগে চারাগাছ বিতরণ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক অন্যতম গতিবিধি হলো গ্রাম বিকাশ। বাঁকুড়া জেলার তাজপুর গ্রামের এই গ্রাম বিকাশের কাজ শুরু হয় ২০০৩ সালে মা সারদার সার্ধ জন্মশতবর্ষে ' মা সারদা গ্রাম বিকাশ সমিতি'র মাধ্যমে। বর্তমানে তাজপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে ১২টি গ্রামে ১০ সমিতি তৈরি করে গ্রাম বিকাশের কাজ চলছে। এই ১০টি সমিতি মিলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম বিকাশ পুঞ্জ' তৈরি হয়েছে। এই পুঞ্জের মাধ্যমে নিত্য ও নৈমিত্তিক মিলে ৪৫টি সেবা ও সংস্কারমূলক কাজ চলছে। ৩০টি সংস্কার ও পাঠদান কেন্দ্রে ৪০০ শিশু ভাই-বোনের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতমানের পাঠদানও চলছে। বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং নিজের হাতে ফলের গাছ লাগিয়ে সেই গাছ থেকে

ফল খাওয়ার ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও ৩০ কেন্দ্রে মোট ৪০০ শিশু ভাই-বোনকে বিভিন্ন ফলের চারাগাছ বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। গত ১৩ জুলাই দেশড়া গ্রামে বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ সমিতির উদ্যোগে ৮০ জন শিশুর হাতে বিভিন্ন ফলের চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। চারাগাছ বিতরণের এই কার্যক্রমে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. তিলকরঞ্জন বেরা এবং সমাজ সেবা ভারতীর রাজকুমার ঝা।

বিএমএসের নেতৃত্বে পেট্রাপোল স্থলবন্দরে শ্রমিক সমাবেশ

গত ১৩ জুলাই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নেতৃত্বে বনগাঁ পেট্রাপোল স্থলবন্দরে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক সমাবেশ সংঘটিত হয়। সম্প্রতি পেট্রাপোল স্থলবন্দরকে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে বাংলাদেশ জলপথে পণ্য পরিবহণ করছে। অথচ এই পেট্রাপোল স্থলবন্দর থেকে প্রতিদিন কয়েকশো ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশে ঢুকছে। ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই স্থলবন্দরকে ব্যবহার না করায় ভারতের লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছে, কিন্তু ভারত থেকে বাংলাদেশে ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের বেনাপোলের শ্রমিকরা লোডিং-আনলোডিঙের কাজ করে তাদের রুটি-রুজি বজায় রেখেছে। এমতাবস্থায় ভারতের স্থলবন্দরের লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকরা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিএমএসের নেতৃত্বে এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। বিএমএসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি অরুণাভ পোদ্দার এদিন বলেন যে, ভারতীয় লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। এই সমাবেশ থেকে ভারতীয় লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য কেন্দ্রীয় জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের পতাকাকে সরিয়ে রেখে বিএমএসের নেতৃত্বে এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সমাবেশে যোগদান করে এবং সমস্ত শ্রমিক নেতৃত্ব এই সমাবেশে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন। বিএমএসের যোগ্য নেতৃত্বে বিভিন্ন সংগঠনের পতাকার বাইরে এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সমাবেশ— শ্রমিক আন্দোলনের পরিসরে বিএমএসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরবে বলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মতপ্রকাশ করেছেন।

গাজোল সেবাভারতী ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ১২ জুলাই মালদহ জেলার গাজোলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত স্বয়ংসেবক স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গাজোল সেবাভারতী ট্রাস্ট এবং গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় একটি রক্তদান শিবির। এই মহতী কার্যক্রমে ৪২ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩ জন মহিলা। রক্তদান কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী এবং সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ বাদল দাশ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সকলের হাতে বিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। এদিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডুর পুত্র কাজল কুণ্ডু মহাশয়ের বাসভবনে একটি শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ২২ জন সন্ন্যাসী পরিচালনা করেন। নেতৃত্ব দেন পূজ্য বিভূতি মহারাজ। যজ্ঞ সমাপনের পর কাজল কুণ্ডু অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের তাঁর বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করেন। এই ভোজেও প্রায় ৫০০-র বেশি ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

সারা দেশজুড়ে পুণ্যশ্লোকা মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের জন্মের ৩০০ বছর পূর্তি পালন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি লোকমাতা রানি রাসমণির জন্মের ২৩২ বছর চলছে। গত ১২ জুলাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় বিধাননগর-স্থিত আজাদ ভবনে উদ্‌যাপিত হলো মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের ৩০০তম জন্মবার্ষিকী। একই সঙ্গে স্মরণ করা হলো লোকমাতা রানি রাসমণিকেও। এই দুই রানি বিধবা হয়েও অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে রাজ্য তথা নিজের জমিদারি অঞ্চল শাসন করেছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচিত হলো তাঁদের গৌরবগাথা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে ভারতমাতা, মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকর ও রানি রাসমণির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গান হওয়ার পর দুই মহীয়সী নারী সম্পর্কে আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাশ। মহারানি অহল্যাবাঈ, রানি রাসমণির ঐতিহাসিক অবদান স্মরণ করার সঙ্গে দেশজুড়ে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কাজ এবং এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাসজী। সভায় উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, বিশিষ্ট অভিনেতা ও সমাজসেবী রুদ্রনীল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেনের অধ্যাপিকা ড. পাপিয়া মিত্র, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি অনিমেষ পাহাড়ী, প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, প্রান্ত মহিলা প্রমুখ ড. অলি ব্যানার্জি, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ এবং 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক মিলন খামারিয়া, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর শাখার সভাপতি সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা মহানগর শাখার সম্পাদিকা দীপান্বিতা মণ্ডল, স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

আলোচনাসভার প্রথম বক্তা রমাপদ পাল তাঁর বক্তব্যে মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তাঁর বাল্যকাল, মালওয়া রাজ মলহার রাও হোলকরের পুত্র খাণ্ডেরাও হোলকরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, প্রথমে স্বামীবিয়োগ এবং তারপর তাঁর শ্বশুরের প্রয়াণের পরবর্তী পর্যায়ে মালওয়া রাজ্যের মহারানি হিসেবে তাঁর অভিষেকের ইতিহাস তিনি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ১৭৬৭ থেকে ১৭৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন দশক ধরে মহারানি অহল্যাবাঈ সর্বোচ্চ পারদর্শিতা ও প্রজাবৎসলতার সঙ্গে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। ভগবান শিব ছিলেন তাঁর পরমারাধ্য। উত্তর হিমালয়ের দুর্গম কেদারনাথ থেকে শুরু করে বারাণসী, অযোধ্যা, গয়া, পুরী, মথুরা, দ্বারকা, সোমনাথ-সহ দেশের দক্ষিণতম প্রান্তে রামেশ্বরম পর্যন্ত শত শত মন্দির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকর। তাঁর প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল শত শত সরাইখানা, ধর্মশালা, স্নানঘাট। তাঁর নির্দেশে হয় অসংখ্য জলাশয় খনন, রাজপথের পাশে করা হয় বৃক্ষরোপণ। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পেও রয়েছে তাঁর অসাধারণ অবদান। 'মহেশ্বরী' নামক সিল্ক শাড়ির নকশা তৈরি থেকে শুরু করে এই শাড়ির উৎপাদন তিনিই শুরু করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সংস্কারিত মন্দিরগুলি পূজার্চনা ছাড়াও অগণিত দরিদ্র মানুষের প্রতিদিনের অন্নসংস্থান ও আশ্রয়দানের কাজেও নিয়োজিত থাকত। রাজ্যের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনীর মাধ্যমে তিনি ডাকব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। মহারানির দিশানির্দেশে এসময়

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বিকাশের শিখরে পৌঁছায় মালওয়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রজা কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব, ভূমিহীন চাষীদের জমির মালিকানা দান, রাজস্ব ব্যবস্থার সরলীকরণ, মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি, বণিক-কারিগরদের পেশার সুরক্ষাদান, বাণিজ্য তথা জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে স্থল ও জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সবস্তরের রাজকর্মচারীর দুর্নীতি দমন, রাজ্যের আয়-ব্যয়ের নিখুঁত হিসাবরক্ষা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে তিনি বাহ্যিক অরাজকতা সত্ত্বেও নিজের শাসনাধীন অঞ্চলকে একটি সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করেন। প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে বিনা যুদ্ধে তাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে তাঁর কূটনৈতিক ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অনাড়ম্বর। কঠিন বৈধব্য জীবন যাপন করেন তিনি। নিজের বিধবা কন্যা মুক্তাবাঈকে সতীদাহের আগুন থেকে বাঁচাতে না পারলেও মালওয়া রাজ্যের অসংখ্য স্বামীহারা বিধবা ও অসহায় নারীদের সহমরণের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের বিধবা ও সন্তানহীন নারীদের সম্পত্তি ও দত্তকসন্তান গ্রহণের অধিকারকে তিনি মঞ্জুরি দিয়েছিলেন। মালওয়া রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে বিপুল জনসেবা এবং মন্দির সংস্কার-সহ তাঁর অবদানের কথা সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

বঙ্গপ্রদেশে 'লোকমাতা' হিসেবে পরিচিত রানি রাসমণির জীবন বৃত্তান্তটি উপস্থাপন করেন ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাশ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ব্রিটিশের অত্যাচারের হাত থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা, দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণ, তাঁর প্রবর্তিত রথযাত্রা, বাবুঘাট, আহিরীটোলা ঘাট ও নিমতলা ঘাট নির্মাণ-সহ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) ও হিন্দু কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার সময়ে রানি রাসমণির অর্থসাহায্যের ইতিহাস। রুদ্রনীল ঘোষ বলেন যে, তাঁরা মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরকে নিয়ে একটি নাটক প্রযোজনা করেছেন। নাটকটি কয়েকবার মঞ্চস্থও হয়েছে। তাঁর জীবন ও কীর্তিগাথা তাঁরা সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অলি ব্যানার্জি এবং 'উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষ থেকে নমিতা নায়েক। অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি পাঠ করে শোনান 'স্ফুলিঙ্গ কলাকেন্দ্র'-এর কলাকুশলীরা, পরিচালনায় ছিলেন সংযুক্তা মুখার্জি ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজ সিংহ, কাকলী মণ্ডল ও শিপ্রা ঘোষ। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের অফিস সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ নাথ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, কলকাতা মহানগরের অফিস সেক্রেটারি শুভজিৎ দাশগুপ্ত।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আদর্শ মঞ্চের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ১৩ জুলাই 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আদর্শ মঞ্চ'-এর উদ্যোগে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর তরুণ শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের উপর একটি গীতি আলেখ্য। এরপর শুরু হয় মূল সভা। এদিনের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তাপস রায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজ কুমার রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য, ভারতীয় যুব মোর্চার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অমিতাভ রায় এবং বিজেপি-র উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। তাঁদের প্রাঞ্জল বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন বৃত্তান্ত। তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তাঁর জীবনাদর্শ। তাঁর নির্মিত বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর গুরুত্ব এবং আগামীদিনে এই রাজ্যকে রক্ষা করার বিষয়ে সকলকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার সংকল্পগ্রহণের উপর তাঁরা বিশেষভাবে জোর দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম মালাকার ও গৌতম দাশগুপ্ত।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

শিলিগুড়িতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন

গত ৬ জুলাই শিলিগুড়ি শহরের অম্বিকানগর শান্তিপাড়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূজ্য হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ড. সুমন কুমার, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সংযোজক মিঠুন সাহা, প্রান্ত সদস্য প্রশান্ত সরকার এবং শিলিগুড়ি মহানগর সংযোজক সঞ্জয় রায়।

সম্মেলনে বহু নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা হিন্দুদের আগামীদিনে কঠোর পরিশ্রম ও লড়াই করার পাশাপাশি মায়েদের কাছে বিশেষ অনুরোধে জানান যে তাঁরা যেন ৫০০, ১০০০ টাকার লোভে এই রাজ্যটিকে জেহাদিদের হাতে তুলে না দেন।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে প্রণব মঠের সন্ন্যাসিনী জ্ঞানদানন্দময়ী মাতাকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

গত ৯ জুলাই শ্রীগুরুপূর্ণিমার প্রাক সন্ধ্যায় দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রণব কন্যা সঙ্ঘের পরমপূজ্যা তৃতীয় সভানেত্রী সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মাতাজীকে 'দেশের মাটি শীর্ষ সম্মান' প্রদান বিকেলে করা হয়। এদিন বারাসাত হৃদয়পুর প্রণবকন্যা সঙ্ঘের স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সভাকক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আশ্রমে আগত ভক্তমণ্ডলী। মাতাজীকে চন্দন তিলক, মালা ও শাল পরিয়ে বরণ করে নেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্যা শম্পা বিশ্বাস ও সৌমিতা বিশ্বাস কুণ্ডু। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় তুলসীগাছ, গীতা এবং ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'তুলসীকথা' বই। মাতাজীর হাতে ফলের ঝুড়ি তুলে দেন অধ্যাপক ও সমাজসেবী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য সুশান্ত মজুমদার। মাতাজীর সেবামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোকপাত করেন ডাঃ তরুণ সরকার এবং ড. সৈকত মিত্র। সমাজসেবী দিলীপ মণ্ডল মাতাজীর জীবনী পাঠ করে শোনান। সভায় মঙ্গলাচরণ করেন দিলীপ বিশ্বাস, তপন কুমার রায়, পরিতোষ আচার্য ও তুষার ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিলন খামারিয়া। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুমন কুমার রায়, রাজদীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অসীমলাল মুখোপাধ্যায়।

হারানো পত্রিকা— এক

অর্চ্চনা—পত্রিকার নামেই ডাকঘর

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হারায় নাতো কিছুই। 'রাতের সব তারাই আছে/ দিনের আলোর গভীরে।' একদিন যেসব পত্রপত্রিকা চলত রমরমিয়ে, এখন তারা বিলুপ্ত। সেসব পত্রিকার ঠাঁই এখন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু সেসব পত্রিকা ধরে রেখেছে সমকালের সমাজ ও রুচির কথা। তার মধ্যেই রয়ে গেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গড়ে ওঠার, এগিয়ে চলা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুখ থুবড়ে পড়ার কথা। আজকের বিস্মৃত সেসব পত্রিকায় রয়ে গেছে বর্তমানের শিকড়। আছে ভবিষ্যতের দিশা। তাই বিস্মরণ নয়, তাদের স্মরণেই এই গদ্যধারা।

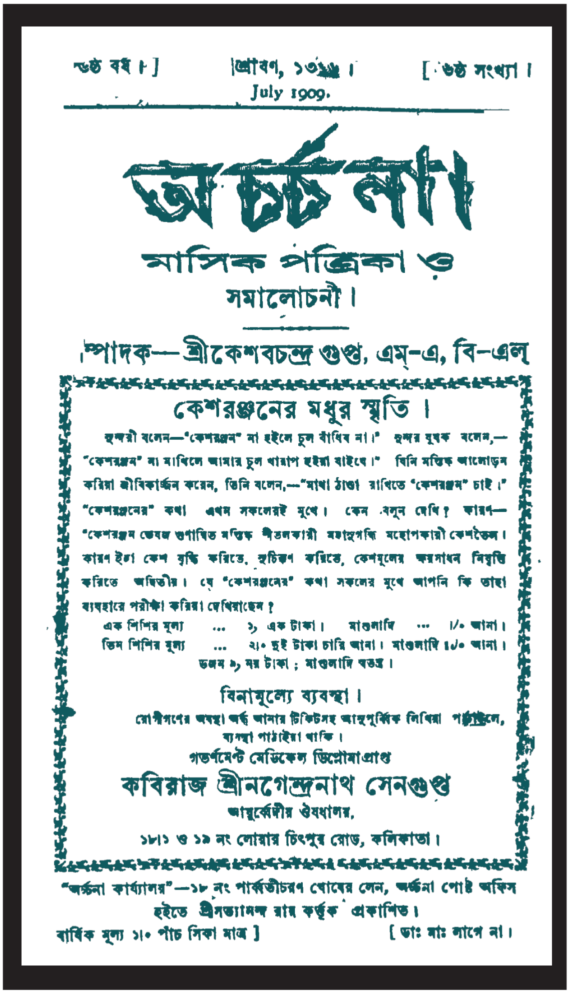

৬ষ্ঠ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৬। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।
July 1909.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

কেশরঞ্জনের মধুর স্মৃতি।

সুন্দরী বলেন—"কেশরঞ্জন" না হইলে চুল বাঁধিব না।" সুন্দর যুবক বলেন,—"কেশরঞ্জন" না মাখিলে আমার চুল খারাপ হইয়া যাইবে।" যিনি মস্তিক আলোড়ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তিনি বলেন,—"মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে "কেশরঞ্জন" চাই।" "কেশরঞ্জনের" কথা এখন সকলেরই মুখে। কেন বলুন দেখি? কারণ—"কেশরঞ্জন ভেষজ গুণান্বিত মস্তিষ্ক শীতলকারী মহাসুগন্ধি মহোপকারী কেশতৈল। কারণ ইহা কেশ বৃদ্ধি করিতে, সুচিক্কণ করিতে, কেশমূলের দৃঢ়সাধন নিবৃত্তি করিতে অদ্বিতীয়। যে "কেশরঞ্জনের" কথা সকলের মুখে আপনি কি তাহা ব্যবহারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

এক শিশির মূল্য ... ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ... ।/০ আনা।
তিন শিশির মূল্য ... ২।০ দুই টাকা চারি আনা। মাশুলাদি ।।/০ আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

পত্রিকার নামে ডাকঘর। কিছুটা অবাক করা কথা, তবুও সত্যি তা। পত্রিকার নামে আসা চিঠিপত্র, আর গ্রাহকের কাছে পাঠানো পত্রিকার চাপে হিমসিম খাওয়া ডাকঘরের অন্যান্য কাজ প্রায় শিকেয় ওঠার অবস্থা। সবকিছু সামাল দিতে তাই সেই পত্রিকার জন্য তারই নামে পৃথক একটি ডাকঘর খোলা। প্রায় বিরল এই ঘটনাই ঘটেছে এই রাজ্যে স্বাধীনতার বহু বছর আগে। সংখ্যাটা বেশিও হতে পারে, কারণ সবগুলির হদিশ জানা নেই। তবে অন্তত দুটি ডাকঘর এখনো সংশ্লিষ্ট পত্রিকার নামে আজও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের রোজকার কাজকর্ম। একটি দৈনিক পত্রিকা অমৃতবাজারের নামে, ঠিকানা যার বাগবাজারের ১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে। অন্যটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অর্চ্চনা' বা 'অর্চনা'-র নামে— জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কাছে ১০, বারাণসী ঘোষ লেনে।

সাহিত্য পত্রিকা মাসিক 'অর্চ্চনা'। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। নামের বানানে ছিল দুটি 'চ'। পরবর্তীকালে অবশ্য 'বিদায় নেয় একটি 'চ'— তখন থেকে পত্রিকার নাম শুধুই 'অর্চনা'। পত্রিকার পরিচয় বা উপনাম ছিল 'মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী'। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে, ইংরেজি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।

জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ির লাগোয়া গলি পার্বতীচরণ ঘোষ লেন এবং রাধানাথ সাধু লেন জুড়ে ছিল সুবর্ণ বণিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারিণীচরণ চন্দ্রর বিরাট বাড়ি। তারিণীচরণের ছেলে কৃষ্ণদাস চন্দ্রের পৈতৃক ব্যবসার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল সাহিত্যচর্চা ও বেড়ানোর। দেশের নানা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে সেখানকার সবকিছু নিয়ে তিনি লিখতেন ভ্রমণ কাহিনি। বাড়িতে তিনি নিয়মিত বসাতেন মজলিশ। সেই মজলিশি আড্ডায় আসতেন কৃষ্ণদাসের মতোই সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধুবান্ধবের দল। বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁরা। সেইসঙ্গে পড়তেন নিজেদের লেখা। সে লেখার দোষ-গুণ পর্যালোচনা করে তাঁরা নিজের সৃষ্টিকে আরও ত্রুটিহীন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। সেই সাহিত্যের আড্ডাতেই তাঁরা মূলত নিজেদের লেখা প্রকাশের জন্যই একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যায়, কৃষ্ণদাস সেটি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানদার হওয়ার

প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়। সকলে আলাপ আলোচনা করেও কিন্তু পত্রিকার নাম ঠিক করতে পারেন না। আর তখনই সিদ্ধান্ত, এ ব্যাপারে তাঁরা দ্বারস্থ হবেন রবীন্দ্রনাথের।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আর তারিণী চন্দ্রর বাড়ির মধ্যে ছিল খুবই হৃদ্যতা। পড়শি হিসেবে দু'বাড়ির লোকজনের মধ্যে ছিল নিয়মিত যাতায়াত। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যথেষ্ট সখ্য ছিল কৃষ্ণদাসের। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়াটা কোনো কঠিন ব্যাপার হলো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেদের আর্জি জানালেন তাঁরা। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। একটি ভালো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য কী কী করা দরকার সে সম্পর্কে তাঁদের নানা পরামর্শ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে এমন উৎসাহ পাওয়া যাবে কৃষ্ণদাস এবং তাঁর বন্ধুরা অতটা আশা করেননি। তাই প্রস্তাবিত নতুন পত্রিকার জন্য নিয়মিত লেখা দিয়ে সাহায্য করার আবদার জানান তাঁরা। এ ব্যাপারে কবি কী বলেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে পত্রিকার নামকরণের কথা বলতে প্রায় না ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, তোমাদের নতুন কাগজের নাম রাখো 'অর্চ্চনা'।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও উৎসাহ পেয়ে কৃষ্ণদাস চন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুরা এবার তাঁদের ওই আড্ডার নামও দিলেন 'অর্চ্চনা সমিতি'। ২৯নং পার্বতীচরণ ঘোষ লেন হলো অর্চ্চনা সমিতির কার্যালয়। সেটাই হলো পত্রিকারও ঠিকানা।

নতুন পত্রিকার সম্পাদক হলেন তরুণ ব্যবহারজীবী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এমএবিএল। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হলেন কৃষ্ণদাস চন্দ্র। প্রকাশকও তিনিই। ত্রিশ পৃষ্ঠার কাগজটির মাসিক মূল্য ছিল দু' আনা। ডাকমাশুল-সহ বার্ষিক মূল্য রাখা হয় এক টাকা চার আনা।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ছিল রামদয়াল মজুমদার, এমএ-র প্রবন্ধ 'আদি দম্পতী', উমাচরণ ধরের ধারাবাহিক গাথাকাব্য 'রাঠোর-বালক' এবং অন্য একটি কবিতা, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, এমএবিএল-এর প্রবন্ধ 'মুদ্রা', 'শ্রী' নামে লেখা একটি পত্রিকা 'প্রেম ও শ্মশ্রু', কৃষ্ণদাস চন্দ্রর একটি গান।

প্রথম সংখ্যায় সে-অর্থে নামকরা বা প্রতিষ্ঠিত প্রায় কোনো লেখকের রচনা না থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাটি সাধারণ মানুষের বেশ ভালোই লাগে। তাতেই উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ 'অর্চ্চনা'-কে একটি সফল পত্রিকায় রূপান্তরিত করার কঠিন লড়াইয়ে শামিল হন।

বাংলা পত্রপত্রিকার জগতে কোনো নতুন আদর্শ বা মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে 'অর্চ্চনা' প্রকাশিত হয়নি। সাহিত্য জগৎকে নতুন কোনো দিশা দেখানোর দাবিও করতে পারে না পত্রিকাটি। সেভাবে অতি জনপ্রিয় কোনো লেখকের রচনা না-থাকা সত্ত্বেও 'অর্চ্চনা' প্রথম দু' বছরের মধ্যেই সাহিত্য-জগতে গ্রাহক সংখ্যার দিক থেকে একটা বড়ো ধরনের বিপ্লব আনে।

যতদূর জানা যায়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার ছাড়িয়ে যায়। ফলে ওই অঞ্চলের একমাত্র ডাকঘর বড়বাজারের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে থাকে। কৃষ্ণদাস চন্দ্র তাই স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি পৃথক ডাকঘরের দাবি জানিয়ে চিঠি লেখেন। একই সঙ্গে তিনি দরবার করেন গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে। কৃষ্ণদাসের সে আবেদন মঞ্জুর হলো। বড়বাজার ডাকঘরের অধীনে একটি উপডাকঘর খোলা হলো ১৮নং পার্বতী ঘোষ লেনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ডাকঘরের জন্য জায়গাটা ছোটো হওয়ায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সেটি উঠে যায় কৃষ্ণদাসের বন্ধু যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১০নং পার্বতী ঘোষ লেনে ৫১ টাকা চার আনা ভাড়ায়।

'অর্চ্চনা' পত্রিকা উঠে গেছে বছর পঁয়ষট্টি আগে, কিন্তু এই নামের ডাকঘরটি আজও আছে। অবশ্য ওই বাড়িটির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। মালিকানা বদলের পর মূলত শরিকি বিবাদের জন্য করা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় মেরামতি। প্রসঙ্গত, এই ডাকঘরেই আসে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির চিঠিটি।

যাক সে কথা। আবার বরং আসা যাক 'অর্চ্চনা' পত্রিকার আলোচনায়। পত্রিকাটি চলেছিল দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর। নানা কারণে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে উঠে যায় এটি। তখন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। পত্রিকা বন্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি দায়ী করেছিলেন সিনেমা জাতীয় লঘু পত্রপত্রিকাগুলিকে।

প্রথম থেকেই 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় স্থান পেত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি, বৈদেশিক সমাচার এবং নানা রোমাঞ্চকর গল্প, প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনি, প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থ সংক্রান্ত রচনা, স্বদেশ চেতনার গল্প, নারী জাগরণের কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানের কাহিনি এবং আরও নানা বিষয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ বছর সম্পাদনার পর বন্ধু কেশবচন্দ্র গুপ্তকে এক চিঠিতে ব্যক্তিগত কারণে কর্মভার ত্যাগের কথা জানিয়ে তাঁকেই সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে বলেন। সেইমতো 'অর্চ্চনা'র ষষ্ঠ বর্ষ থেকে সম্পাদক হন কেশব চন্দ্র গুপ্ত। একসময় কেশব চন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হন কৃষ্ণদাস চন্দ্র। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর পর সম্পাদক হন তাঁর ছেলে রণজিৎ চন্দ্র। 'অর্চ্চনা' পত্রিকার ৫৬ বছরের জীবনকালে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন চিত্রিতা দেবী, প্রতাপ চন্দ্র।

'অর্চ্চনা'র প্রথম দিকে ওই পত্রিকায় লেখালেখি করতেন বাংলা সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার বিভিন্ন গৌণ লেখক। কিন্তু সেসব লেখা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। ফলে সে যুগে প্রবাসী, ভারতবর্ষ বা মাসিক বসুমতীর মতো উচ্চমানের পত্রিকা বাজারচলতি পত্রপত্রিকাকে মাত করে 'অর্চ্চনা'। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রথম থেকেই পত্রিকাটি ছিল লাভজনক। সে কারণেই কৃষ্ণদাস চন্দ্রর ছোটোছেলে বাসুদেব চন্দ্র ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২২০০ টাকায় নিজেদের বাড়িতে অর্চনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং অর্চনা পাবলিশার্স প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকাশন সংস্থা থেকেই প্রতাপ চন্দ্রর 'জব চার্নকের বিবি', বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী থেকে শুরু করে

বাংলাসাহিত্যের বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার বিভিন্ন বই।

'অর্চ্চনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখতেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। কিন্তু সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পার্বতী ঘোষ লেনে অর্চ্চনা ভবনে অর্চ্চনা সমিতির যে সাহিত্য মজলিশ বসতো সেখানে বিভিন্ন সময় আসতেন রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, চিত্রিতা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, কবি কালিদাস রায় প্রমুখ বঙ্গের বিশিষ্ট লেখক-লেখিকা।

'অর্চ্চনা'র প্রথম দিকের লেখক তালিকায় ছিলেন কৃষ্ণদাস চন্দ্র, সরসীবালা দেবী, নগেন্দ্রনাথ সোম, নলিনী ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ রায়, ধরিত্রী দেবী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, জীবনেন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মসুন্দর সান্যাল, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে কবি কালিদাস রায়, হরিহর শাস্ত্রী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিষ্ণুপদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি দে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

পরবর্তীকালে পত্রিকার নামের বানান বদল হয়ে 'অর্চনা' হয়। সেইসঙ্গে পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিতদের লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে। ওই তালিকায় আছেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অন্নদাঙ্কর রায়, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, কালিদাস নাগ প্রমুখ।

'অর্চ্চনা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের কিছুদিন পর থেকেই এই পত্রিকার সুখ্যাতিতে সমকালীন পত্রিকাগুলি মুখর হয়ে ওঠে। বলা হয়, 'অর্চ্চনার আলোচনা করিতে আমাদের আনন্দ হয়। অল্পদিনের মধ্যে মাসিক পত্রিকাখানিতে সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমরা সর্বান্তঃকরণে অর্চ্চনার উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি' (চুঁচুড়া বার্তাবহ)।

প্রায় একই সুরে 'হিতবাদী' পত্রিকার মন্তব্য, 'অর্চ্চনা বাঙ্গলায় শ্রেষ্ঠ মাসিক

'অর্চ্চনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখতেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। কিন্তু সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পার্বতী ঘোষ লেনে অর্চ্চনা ভবনে অর্চ্চনা সমিতির যে সাহিত্য মজলিশ বসতো সেখানে বিভিন্ন সময় আসতেন রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, চিত্রিতা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, কবি কালিদাস রায় প্রমুখ বঙ্গের বিশিষ্ট লেখক-লেখিকা।

পত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।' 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বলা হয়, 'সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চস্থান'। একইভাবে 'বসুমতী'তে বলা হয়, 'অর্চ্চনা পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য।' তৎকালীন বিশিষ্ট পত্রিকা 'সাহিত্য'-র অভিমত, 'অর্চ্চনা অনেক মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। —অর্চ্চনা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'

কেবল বাংলা পত্রপত্রিকায় নয়, সমকালীন ইংরেজি পত্রিকাগুলিও ছিল 'অর্চ্চনা'-র প্রশংসায় মুখর। যেমন দি স্টেটসম্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া মনে করে 'The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengal interests'। 'দি বেঙ্গলি পত্রিকায় বলা হয়, '...Bengali monthly Archana is an assured place among the vermacular periodicals of the country and one of the organs of Indian Public Opinion in Calcutta.'

এইসব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, যে সময় প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীর মতো পত্রিকাগুলি রমরমিয়ে চলছে তখনও অর্চ্চনার এক বিশেষ ধরনের পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তার ফলে প্রচার সংখ্যায় অর্চনা সবসময়েই অনেকটাই এগিয়ে ছিল। সে কারণে পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা প্রথম থেকেই ছিল যথেষ্ট লাভজনক। অর্চ্চনার শুরুর কয়েক বছরের সংখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রথম থেকেই পত্রিকাটিতে বেশ ভালো সংখ্যক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ, তেল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সংখ্যা থেকেই বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরি, কিলবার্ন কোম্পানি, বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডস টনিক ইত্যাদির বেশ কয়েক পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন পেত। পরবর্তীকালে টাটা স্টিল, বামারলরি, বসন্ত মালতী, জিসি লাহা ইত্যাদির মতো বিখ্যাত সংস্থার বিজ্ঞাপন পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে, গুণগত মান অত্যন্ত উঁচুস্তরের না হলেও সাধারণ পাঠককুলের মনোরঞ্জন করার মতো রচনার কারণেই এই মাসিক পত্রিকাটি টানা ছাপান্ন বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক ধরনের নজির গড়ার দাবি রাখে এই পত্রিকা। □

বৈদিক সনাতন হিন্দুধর্মে ঋষিকা পরম্পরা

বন্দনা বিশ্বাস

বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে (যজ্ঞীয় ব্যবহার- বিষয়ক ব্রাহ্মণ ও অরণ্যচারীদের প্রয়োজনীয় বেদ পঙ্‌ক্তি— সংকলন আরণ্যক হয়ে) জ্ঞানান্বেষী উপনিষদ পর্যন্ত বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্রাদির মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রবক্তা বা রচয়িতা সকলে ঋষি বা ঋষিকা বলে পরিচিত। তপ বা গভীর ধ্যানের মাধ্যমে যাঁরা বৈদিক মন্ত্র উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের ঋষি বলা হয়। ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এঁরা বৈদিক মন্ত্র অনুধাবন করতে সক্ষম।

ঋষিকা অর্থাৎ নারী ঋষি, যাঁরা বেদকে উপলব্ধি করেছেন, মন্ত্র রচনা করেছেন। এই সমস্ত বিদুষী নারী ধর্ম ও জ্ঞানের পথে সাধনায় রত থাকতেন। এঁরা বেদজ্ঞা, ব্রহ্মবাদিনী নামে পরিচিতা। এই সমস্ত বিদুষী নারীরা আধ্যাত্মিক জগতে বিশেষ স্থানের অধিকারিণী এবং বেদ সংকলনে পুরুষদের সঙ্গে সমান ভূমিকা পালন করেছেন। তবে বেদজ্ঞা নারীরা শুধুমাত্র বেদ রচনা নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও অংশ নিতেন। তাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সমাজে খুবই সম্মানিত ছিল।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঋষিকা হলেন— অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, শ্রদ্ধা, জুহু, বাক, রোমাশা, সূর্যা ও রাত্রি। এঁরা ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনচর্চায় বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র রচনা করেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা অবিবাহিত থেকে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন চর্চা করতেন তাঁদের ব্রহ্মবাদিনী বলা হতো।

গার্গী : বৈদিক যুগের অন্যতম ঋষিকা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে তাঁর জন্ম। তিনি ঋষি বাচকন্বীর কন্যা। গার্গীর প্রখর ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, নির্ভীকভাবে শাস্ত্র আলোচনা এবং তর্কবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ঋগ্বেদের টীকাকার। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, রাজা জনকের আয়োজিত শাস্ত্রার্থ যজ্ঞে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হন। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ক্রমশ প্রশ্নোত্তরের গভীরতা বাড়তে থাকে। বিদুষী গার্গী অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক পেরিয়ে অবশেষে ব্রহ্মলোক নিয়ে প্রশ্ন করেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে। এই পর্যায়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে থামতে বলেন। স্মরণ করিয়ে দেন যে, বৈদিক প্রশ্নোত্তরের সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে। ঋষি উদ্দালকের প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে গার্গী পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে আরও দুটি প্রশ্ন করার অনুমতি চান। প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য জয়ী হলে বিদুষী গার্গীর জ্ঞান ও বিদ্যা সকলের নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

ঘোষা : ঋগ্বেদের একজন বিখ্যাত ঋষিকা হলেন ঘোষা। তাঁর জন্ম ঋষি অঙ্গিকার বংশে। ঋষিকা ঘোষার পিতার নাম কক্ষিবাণ। পিতামহ ছিলেন ঋষি দীর্ঘাত্মা। ছোটোবেলায় তিনি চর্মরোগে ভুগেছিলেন। দেববৈদ্য অশ্বনীকুমারদ্বয় তাঁকে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী। তিনি ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি ব্রহ্মের বক্তা বা ব্রহ্মবাদিনী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। যেহেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন তাই তিনি তাদের প্রশংসায় ঋগ্বেদের দুটি স্তোত্র রচনা করেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯-৪১তম সূক্তের তিনি স্রষ্টা।

অপালা : ঋষি আবির কন্যা অপালা। তিনি প্রমাণ করেছেন যে নারীরা শুধুমাত্র গৃহিণী নন, বরং জ্ঞানচর্চা, তপস্যা ও দর্শনে পুরুষদের সমকক্ষ বা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়েই ছিলেন। তিনি একজন ব্যতিক্রমী নারী। সমাজের বক্রদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৮০তম সূক্তে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি ঋগ্বেদের সাধিকা হিসেবে পরিচিত। তার রচিত ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ আজও মানবীয় দুর্বলতা, ঈশ্বর ভক্তি এবং নারীর আত্মিক শক্তির সাক্ষ্য বহন করে। নারীর নিজস্ব চেতনা ও ভোগান্তির বর্ণনা আছে তাঁর রচিত মন্ত্রে।

বাক : মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের ১২৫তম সূক্তের স্রষ্টা তিনি। এই সূক্তে মোট আটটি মন্ত্র রয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় থেকে অষ্টম মন্ত্র ত্রিষ্টুপ ছন্দে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি অপতী ছন্দে রচিত। এই সূক্তের মন্ত্রগুলোকে একত্রে 'বৈদিক দেবীসূক্তম্' বলা হয়। ঋষিকা বাকের নামানুসারে এটি 'বাকসূক্তম্' নামে পরিচিত।

রোমশা : অন্যতম বিদুষী নারী রোমাশা। তাঁর পিতা বৃহস্পতি এবং স্বামী ঋষি ভাবভ্য। ঋষিকা রোমাশা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬তম সূক্তের ৭তম মন্ত্রের দ্রষ্টা।

শ্রদ্ধা : বিদুষী শ্রদ্ধা ছিলেন কামায়নী গোত্রের। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫১তম মন্ত্রের ঋষি হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ। মন্ত্রগুলোতে মনুষ্য জীবনের ধর্ম ও জীবনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

সূর্যা : ঋগ্বেদে উল্লিখিত অন্যতম বিদুষী। তার পিতার নাম সবিত্রা। দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্তে এই মহান নারীর উল্লেখ রয়েছে। বিয়ের বহু মন্ত্রের রচয়িতা তিনি। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে নারীর সম্মান ও মর্যাদার অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ঋষি সূর্যার মন্ত্রে।

মৈত্রেয়ী : বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। তিনি আত্মজ্ঞানকেই চূড়ান্ত বলেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'ন হি অতঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'— অর্থাৎ আত্মার কারণে সমস্ত কিছু প্রিয় হয়।

লোপামুদ্রা : ঋগ্বেদ ও মহাভারতে লোপামুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ঋষি অগস্ত্যের পত্নী। তিনি নিজের জীবনের কামনা, দাম্পত্য সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে সংযুক্ত করে মন্ত্র রচনা করেছেন।

ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা : দেবগণের স্তব উচ্চারণ করে ঋত্বিকের কার্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর রচিত তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য-সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করেছেন। তাঁর রচিত ঋকগুলি শব্দ মাধুর্যে ও ভাবসম্পদে এত সুন্দর যে পড়লে বিমুগ্ধ হতে হয়। ঋগ্বেদের ১২৫।১ দেবী সূক্তে তাঁর বিখ্যাত বাণী :

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাভ্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ'— অর্থাৎ তিনি নিজেকে বিশ্বশক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। এটি নারীর আত্মবোধের এক অসাধারণ প্রকাশ।

বৈদিক ঋষিকারা প্রমাণ করে গেছেন যে, নারী কোনো সীমায় আবদ্ধ নন। তাঁরা মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে, ধর্মীয় গঠনশীলতায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সমান পারদর্শী। তাঁদের জীবন শৈলী, সাধনা আজও আধুনিক নারী সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা।

বৈদিক ঋষিকারা প্রমাণ করে গেছেন যে, নারী কোনো সীমায় আবদ্ধ নন। তাঁরা মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে, ধর্মীয় গঠনশীলতায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সমান পারদর্শী। তাঁদের জীবন শৈলী, সাধনা আজও আধুনিক নারী সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা।

গ্রন্থসূত্র : উদ্বোধন পত্রিকায় মহারাজদের আলোচনামূলক লেখা ও হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক লেখা।
ঋকবেদের ঋষিকাগণ—রাধাগোবিন্দ বসু।
বৈদিক সাহিত্য ও নারী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

ফ ঃ ৫

মোদীজীর নেতৃত্বেই প্রযুক্তি, দক্ষতা ও সংকল্পে দেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো

প্রদীপ মারিক

বিশ্বের সেরা নেতা নরেন্দ্র মোদী কেবলমাত্র ভারতবাসীর কথা ভাবেন না, সারা বিশ্বের কথা ভাবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ভবিষ্যতের লক্ষ্যে শীর্ষ সম্মেলন'-এর মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনাকালে মানবকেন্দ্রিক উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন'। ২০২৩ সালের ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (ডিপিডিপি) আইন হিসেবে হলো ভারতের ডেটা সংক্রান্ত গোপনীয়তা আইন। এটি ব্যক্তিগত অধিকার এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতির একটি সূক্ষ্ম মিশ্রণ। ৩ জানুয়ারি, ২০২৫-এ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রক ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (ডিপিডিপি) নিয়মগুলিও প্রকাশ করেছে যাতে সম্মতির জন্য অপারেশনাল কাঠামোর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন, যা এই অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হলো। জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই নতুন রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন তাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বৃদ্ধির গতিপথের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে পরিণত হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত ট্রেনের প্রবর্তন এবং সঙ্গালদানের মতো ছোটো স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংযোগ বাড়ানো, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে এই বিভাগ।

রেলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়াসকে প্রশংসা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ। ৭৪২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু রেলওয়ে বিভাগ পাঠানকোট, জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর ও বারামুল্লা'র পাশাপাশি ভোগপুর সিরওয়াল- পাঠানকোট, বাটালা-পাঠানকোট এবং পাঠানকোট-জোগিন্দর নগর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে জম্মু রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিল প্রথম ট্রেন, কিন্তু তার পরে ৫০ বছর ধরে কোনো অগ্রগতি হয়নি। প্রশাসনিক অদক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করার আশানুরূপ সদিচ্ছা দেখায়নি। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ বছরের ব্যবধানে জম্মু-কাশ্মীরে রেলের সম্প্রসারণ কাজ পুনরায় শুরু করেন যার জন্য অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২৩-২৫ সালে মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টিতে উল্লেখিত হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে হাতের তালুর মধ্যে চলে এল। ভূস্বর্গে পৌঁছাতে এতদিন জম্মু থেকে সড়কপথে অথবা বিমানে শ্রীনগর যাওয়াই ছিল দস্তুর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারতের' হাত ধরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চেনাব রেলসেতুর উদ্বোধন হলো, যা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের থেকেও উঁচু। ভ্রমণার্থীদের জন্য আরও সুখবর চন্দ্রভাগা সেতু পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে প্রায় মেঘের রাজ্য দিয়ে গড়গড়িয়ে ছুটে যাবে বন্দে ভারত ট্রেনও। ধনুকের মতো আকৃতির এই সেতু নদীর ১১৭৮ ফুট উঁচুতে। অর্থাৎ প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের থেকে ৩৫ মিটার উঁচু। এই সেতু নির্মাণের সময় বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাজনিত পরীক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন উচ্চতার কারণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ সহ্যশক্তির পরীক্ষা, চরম তাপমাত্রার পরীক্ষা, ভূমিকম্প-রোধক ব্যবস্থা এবং চন্দ্রভাগার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে ধস রোধের ব্যবস্থা। ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার গতিবেগের ঝাপটা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এই সেতুর। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার চন্দ্রভাগা নদীর উপর দিয়ে তৈরি হয়েছে ব্রিজ। এই ব্রিজটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ যেখান দিয়ে ট্রেন ছুটবে।

> **বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে মোদীজী, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ত্বরান্বিত করেছেন। তিনি বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজই করে দেখান।**

পাশাপাশি শ্রীনগর থেকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের যাওয়ার জন্য রেলস্টেশন কাটরা পর্যন্ত যাওয়ার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। ট্রেনটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতুর উপর দিয়ে মাত্র তিন ঘণ্টায় পৌঁছবে। সড়ক পথে এরজন্য সময় লাগে প্রায় সাত ঘণ্টা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরে পা রাখলেন মোদী। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার এই ব্রিজের অনুমোদন দেয়। মাঝে কাজ বন্ধ থাকলেও ২০২২ সালের আগস্টে ব্রিজের নির্মাণকাজ শেষ হয়। ব্রিজটি স্টিল ও কংক্রিট দিয়ে তৈরি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮ থাকলেও ব্রিজের কোনো ক্ষতি

চেনাব রেলসেতু

হবে না। বড়ো বিস্ফোরণেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম। সন্ত্রাসবাদী হামলায়ও ব্রিজের ক্ষতি হবে না। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই কাশ্মীরকে রেলপথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

উপত্যকার উধমপুর-বারামুলা-শ্রীনগর সংযোগকারী ২৭২ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে রেললাইন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করা গিয়েছে। চন্দ্রভাগা রেলসেতুর (চেনাব ব্রিজ) দৈর্ঘ্য ১.৩ কিলোমিটার। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। চন্দ্রভাগা নদী থেকে এই সেতুর উচ্চতা ৩৫৯ মিটার (১১৭৭.৮২ ফুট)। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন ছুটতে পারবে এই সেতুর উপর দিয়ে। রিখটার স্কেলে আট মাত্রার ভূমিকম্পও একে টানতে পারবে না। এই সেতু ১২০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে দাবি নির্মাতাদের। গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। তারপর পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করে ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক পাক জঙ্গি ঘাঁটি। প্রত্যাঘাতের সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। এরপর টানা চারদিন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত চলেছে। গত ১০ মে সংঘর্ষবিরতিতে আবেদন জানায় পাকিস্তান কিন্তু ভারত সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে আঘাত হলে প্রত্যাঘাত চলবে। পহেলগাঁও হামলা এবং 'সিঁদুর' অভিযান পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চেনাব সেতুর নির্মাণের প্রস্তাব ২০০২ সালে করা হয়েছিল, তবে অনুমোদন ২০০৩ সালে প্রদান করা হয়েছিল।

সেতুর নকশা কোঙ্কণ রেলওয়ে, এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ডিআরডিও দ্বারা করা হয়েছিল এবং ২০২২ সালের ১৩ আগস্ট উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেতুর খিলানের নির্মাণ কাজ ২০২১ সালের ১৩ আগস্ট উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেতুর খিলানের নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে এপ্রিল মাসে শেষ হয়েছিল। সেতুতে রেল ট্র্যাক স্থাপনের কাজ ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু ও মার্চ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল এবং এটির উপর একটি ট্রায়াল রান ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পরিচালনা করা হয়েছিল। নান্দনিকতা, অর্থনীতি ও স্থানীয় দক্ষতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা বিবেচনা করে চেনাব রেল সেতুটিকে একটি বৃহৎ পাটাতন বিশিষ্ট ইস্পাত নির্মিত একক খিলানের সেতু হিসেবে নকশা করা হয়েছিল, যার উভয় পাশে পার্শ্ব পাটাতন সংযুক্ত রয়েছে। সেতুর কৌরি প্রান্তের দিকে একটি সংযোগ সেতু রয়েছে। উত্তর রেলওয়ে কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জম্মু ও বারামুল্লার কাছে উধমপুর শহরের মধ্যে ভারতীয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের জুড়ে একটি নতুন রেলপথ নির্মাণের অতিবৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০২ সালে একটি জাতীয় প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এটি উত্তর রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত হয়।

আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের সহায়তায় ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম নির্মাণ গোষ্ঠী শাপুরজী পালোনজী গোষ্ঠীর একটি অংশ, এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে নকশা ও নির্মাণ চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। কোঙ্কণ রেলওয়ে কর্পোরেশন দ্বারা প্রধান নির্মাণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) সেতুটির নকশা তৈরিতে সাহায্য করেছিল, বিশেষ ইস্পাত ব্যবহার করে সেতুকে বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী করে তোলে। গত ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর উপর নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর উদ্বোধন করলেন। এই ঐতিহাসিক সেতুটি জম্মু ও কাশ্মীরের উপত্যকাকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে রেলপথে সংযুক্ত করবে। ভারতের ইতিহাসে এদিনটি এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্রকল্পটিকে দেশের প্রযুক্তির দক্ষতা এবং সংকল্পের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, এই সেতু কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আনবে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণপূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সঙ্ঘের কার্যকরী দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উন্নতির কথা ভাবেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে মোদীজী, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ত্বরান্বিত করেছেন। তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজই করে দেখান। □

নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন : আইএসএল-এ সেরা অধিনায়কেরা

নিলয় সামন্ত

এই তারকারা শুধু আর্মব্যান্ড পরেননি, এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গেও দলের প্রতি অতুলনীয় অবদান রেখে নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হচ্ছে আইএসএল-এর পাঁচজন অধিনায়ককে, যাঁরা কঠিন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সাফল্য, সাহসী সিদ্ধান্ত ও নিখাদ নিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের দলকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

শুভাশিস বোস : আইএসএলে দলকে শিল্ড জেতানো যে কোনো অধিনায়কের পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। আর টানা দুই মরশুমে তা বাস্তবায়িত করে দেখানো— এক অসাধারণ কীর্তি। ঠিক সেটাই করেছেন শুভাশিস। প্রীতম কোটালের বিদায়ের পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অধিনায়ক হন তিনি। অত্যন্ত সংযমী আচরণ ও নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ তাঁকে দায়িত্ব সামলাতে সাহায্য করে। আইএসএল ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসেবে শুভাশিসের নাম নিশ্চয়ই লেখা হবে। ৫০টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। শুধুমাত্র ট্রফিজয়ের জন্য নয়, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ও ঠাণ্ডা মাথায় নেতৃত্বের জন্যও ফুটবলপ্রেমীরা মনে রাখবেন তাঁকে।

সুনীল ছেত্রী : অধিনায়ক, দলনেতা, কিংবদন্তি— এই তিনটি শব্দই সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানানসই। বেঙ্গালুরু এফসির সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখ এই সুনীল। আইএসএল-এ সর্বাধিক ১৩৭টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন— যা এক নজির।

২০১৭-১৮ মরশুমে আইএসএল-এ অভিষেক হওয়ার পর থেকে বেঙ্গালুরু এফসিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। মাঠে তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং মাঠের বাইরে তরুণদের পরামর্শদানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অনেক তরুণ খেলোয়াড়ই তাঁর পরামর্শকে তাঁদের সাফল্যের নেপথ্যে বড়ো কারণ বলে মানেন। নিষ্ঠার প্রশ্নে তাঁর কোনো তুলনা নেই। আইএসএল-এ অভিষেক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গেই রয়েছেন।

অমরিন্দর সিংহ : তিনি যে দলেই খেলেছেন, সেই দলেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে মুম্বই সিটি এফসি এবং বর্তমানে ওড়িশা এফসি-তে তিনি সত্যিই

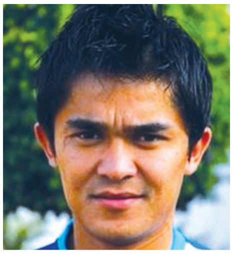

সুনীল ছেত্রী

জোয়াও ভিক্টর

শুভাশিস বোস

অমরিন্দর সিংহ

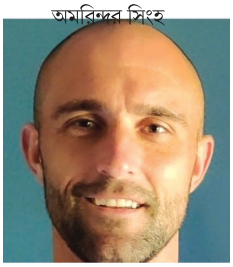

পিটার হার্টলে

নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। ২০২০-২১ মরসুমে তিনি মুম্বই সিটি এফসি-র অধিনায়ক হিসেবে শিল্ড ও কাপ— উভয়ই জিতে জোড়া খেতাব অর্জন করেন। সে মরশুমে২৩ ম্যাচে ১০টি ক্লিন শিট (যৌথভাবে সর্বোচ্চ) ও ৫৯টি সেভ (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) করেন। ২০২২-এ তিনি ওড়িশা এফসি-তে যোগ দেন এবং ২০২৩-২৪ মরসুম থেকে অধিনায়কের দায়িত্ব নেন। ওই মরসুমে দলকে প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে নিয়ে যান এবং সর্বোচ্চ ৮১টি সেভ করেন। ইতিমধ্যেই ৪৮টি ম্যাচে ওড়িশার অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। প্রমাণ করে দিয়েছেন— তাঁর নেতৃত্ব এবং গোলরক্ষার দক্ষতা এখনো আইএসএলে অন্যতম সেরা।

পিটার হার্টলে : যদিও সর্বোচ্চ ম্যাচে অধিনায়কত্বের তালিকায় নেই পিটার হার্টলে, তবু জামশেদপুর এফসিতে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ২০২০-তে দলে যোগ দেওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তিনি অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পান। রক্ষণে তাঁর মুখর ও উজ্জ্বল উপস্থিতি ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে তিনি ছিলেন স্বাভাবিক নেতা। নেতা হওয়ার জন্যই যেন এসেছিলেন হাঁর্টলে।

তাঁর কেরিয়ারের সেরা মুহূর্তগুলি আসে, যখন তিনি দলকে আইএসএল শিল্ড এনে দেন। সে ছিল লিগের ইতিহাসের তাদের প্রথম সাফল্যে। জামশেদপুর এফসির স্বর্ণযুগ আসে তাঁরই নেতৃত্বে এবং এখনো আইএসএলে সবচেয়ে সম্মানিত বিদেশি অধিনায়কদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে।

জোয়াও ভিক্টর : যখন হায়দরাবাদ এফসি-তে যোগ দেন তিনি, তখন দলটি সবে আইএসএলে যাত্রা শুরু করেছিল। চার বছর পর তিনি দলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ও অধিনায়কে পরিণত হন। ভারতের মাটিতে তিনি শুধুই হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন এবং ৫০টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন। একই দলের হয়ে দীর্ঘতম অধিনায়কত্ব করা খেলোয়াড়দের তালিকায় তিনি অবশ্যই শীর্ষে থাকবেন। তিনি ছিলেন হায়দরাবাদ এফসির উত্থানের প্রতীক। শান্ত প্রকৃতির নেতা, প্রবল নিষ্ঠাবান এবং দলের সবচেয়ে সফল অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু।

আত্মনির্ভর ভারত গঠনের পথে নতুন প্রজন্মের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শক্তি ভিন্ন নির্বাহ করা অসম্ভব। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে প্রয়োজনীয় জল, খাদ্য এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য শক্তি প্রয়োজন। এখন এই শক্তি আসবে কোথা থেকে? বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন শক্তি স্থির— কমেও না, রূপান্তর ঘটে মাত্র; অথচ শক্তির ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। অত্যধিক চাহিদার জন্য আমরা অধিক পরিমাণে জীবাশ্ম, জলসম্পদ, এমনকী বিদেশ থেকে পেট্রোলিয়ামজাত শক্তি আমদানি করে চলেছি। তাতে আমাদের প্রচুর বিদেশি মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বিদেশের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

আবার জল ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে প্রচুর গাছ কাটা পড়ে এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। বর্তমান সরকারের স্ব-বোধ জাগ্রত করেছে নতুন প্রজন্মের। উচ্চ শিক্ষিত হয়েও বিদেশের লোভনীয় চাকরির মোহ পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের আত্মনিয়োজিত করেছেন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের কাজে।

শক্তি বার বার ব্যবহার করা যায় কিনা এমন চিন্তাভাবনা করছেন গবেষকরা। পরিবেশ দূষণ, ভূগর্ভস্থিত জলস্তর কমে যাওয়া, বিশ্ব উষ্ণায়ণের মতো সমস্যাগুলি যদি একসঙ্গে সমাধান করা যায়, তাহলে কেমন হয়— এমন চিন্তা করছেন নতুন প্রজন্ম। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাজর্ষি ভড়, খড়্গপুর আইআইটি-র পিএইচডি গবেষক। প্রফেসর ব্রজেশ কুমার দুবে (Dept. of Civil Engineering, IIT Kharagpur) (Chairperson, School of Water Resources, IIT Kharagpur) এবং প্রফেসর মকরন্দ মাধব মাংগরেকর (Director, NIT Puducherry)-র ছাত্র রাজর্ষি এই বিষয়ে নিরলস কাজ করে চলেছেন। হুগলি জেলার দ্বারহাটা গ্রামের ছেলে রাজর্ষির ছোটোবেলা কেটেছে তাঁর বাবার কর্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের বেরিলী এবং হিমাচলপ্রদেশের পালামপুর শহরতলিতে। তাঁর বাবা প্রফেসর রাসবিহারী ভড় (Head, Dept. of Animal Nutrition, College of Vet. Sc & Animal Husbandry, Agartala, Tripura; College of Vet. Scientist-in-Charge Palampur ICAR-IVRI Reg. Station, Principal Scientist ICAR-IVRI Izzatnagar, Bareilly, U.P.)-এর কঠোর অনুশাসনে বাল্যকালেই স্বয়ংসেবক হন।

Hydrothermal carbonization (HTC) একটি উষ্ণ রাসায়নিক পদ্ধতি, যার দ্বারা আর্দ্র-আবর্জনা, যেমন নর্দমার কাদা, খারাপ বা উদ্বৃত্ত খাদ্যাংশ অথবা কৃষিকাজের অবশিষ্ট থেকে কয়লার মতো কঠিন পদার্থ তৈরি করা হয়েছে যার নাম হাইড্রোচার। ওই সব ধরনের বর্জ্য পদার্থ ১৮০-২৫০° সেন্ট্রিগ্রেডে উচ্চ তাপে, বদ্ধ জায়গায় কয়েক ঘণ্টা পুড়িয়ে হাইড্রোচার পদ্ধতিতে ব্লক বানিয়ে (অনেকটা কয়লার মতো) কঠিন অবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করা হচ্ছে। কয়লা বা অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি রূপে ব্যবহার করলে যতটা দূষণ হয়, তার তুলনায় দূষণ ন্যূনতম হয় এই পদ্ধতিতে। এখানে পরিষ্কার জলের পরিবর্তে নর্দমার জল ব্যবহার করা হয়। জীবাশ্মের ওপর নির্ভরশীলতা কম, শক্তির পুনর্ব্যবহার এবং আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকে কৃষিকার্যের পর ফসল নেওয়ার পরে যে অংশগুলি মাঠে পড়ে থাকে, ধানের খোসা, গমের খড়ের আঁটি, আখের ছিবড়ে, গাছপালার পরিত্যক্ত অংশগুলি ব্যবহৃত হয় এইচটিসি পদ্ধতিতে। শহরাঞ্চলের আবর্জনার স্তূপ শক্তির একটি অন্যতম উৎস। রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার জলের পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে নর্দমার জল। এই পদ্ধতি হলো কার্বন-নিউট্রাল অর্থাৎ একটি গাছ প্রকৃতি থেকে যতটা পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করেছে, হাইড্রোচার রূপে ব্যবহার করার সময় সেই পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়বে। শক্তি উৎপাদনে ৩১ শতাংশ পরিষ্কার জলের ব্যবহার কম হবে। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাইড্রোচার শক্তি সঞ্চয় করা যাবে। কঠিন অবস্থায় একটি শক্তি— কৃত্রিম কয়লা, জৈব কয়লা, বায়োচার নামে পরিচিত হতে চলেছে। কয়েকশো বছরের পর তৈরি হয় প্রাকৃতিক জীবাশ্ম, অথচ এই পদ্ধতিতে সময় অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগছে। এই শক্তির ব্যবহারের সময় অপেক্ষাকৃত কম কার্বন পরিবেশে ছাড়ছে, গ্রীন হাউস গ্যাস কম নির্গত হচ্ছে, জল সংরক্ষণ করছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন কম করে একটি পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎস রূপে পরিচিত হতে চলেছে। কল-কারখানা শিল্পে সর্বত্র জীবাশ্মের পরিবর্তে এই বায়োচার আগামীদিনের শক্তি। এটি একটি Renewable এবং Sustainable Source of energy রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। গবেষণার এই বিশেষ ক্ষেত্রটি চয়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছেন রাজর্ষি। সম্প্রতি Mission Life আয়োজিত 'Ideas 4 Life' প্রতিযোগিতায় জল সংরক্ষণের জন্য ভারতে প্রথম স্থান তিনি অধিকার করেছেন। ৫ জুন রাজধানী দিল্লিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপিন্দর যাদব এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী রেখা গুপ্তা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি ও সম্মানিত করেন। □

গল্প

নবাঙ্কুর

আষাঢ়ের প্রথম দিনে

কদিন থেকে খুব মন খারাপ বর্ষার। মন খারাপের কারণ প্রচণ্ড গরম আর পুরো গ্রীষ্মকালটা একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। ঘোর বর্ষায় ওর জন্ম বলেই তো বাবা-মা ওর নাম রেখেছে বর্ষা। শিশুকাল থেকেই আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লেই বর্ষা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

কিন্তু আজ বর্ষার মনটা একটু ভালো। কেননা আজ জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ মাসের শেষদিন। আগামীকাল থেকে আষাঢ় মাস শুরু হবে। অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হবে। বর্ষাকাল মানেই বৃষ্টি। আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে। ভীষণ গরম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এসব যখন ভাবছিল তখন হঠাৎই বর্ষার কানে এল দূরদর্শনের আবহাওয়ার খবর — 'আগামীকাল ভোর থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি নামবে। চলবে ঝড়ো হাওয়া।' শুনে বর্ষার মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বৃষ্টি তার খুব প্রিয়। তাই তো মা-বাবা ওর নাম রেখেছে বর্ষা। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে মনে একরাশ আশা নিয়ে বর্ষা ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে কান ফাটানো মেঘগর্জনে বর্ষার ঘুম ভাঙল। ভয় পেয়ে বিছানায় উঠে বসল বর্ষা। শুনতে পেল বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। তাড়াতাড়ি বিছানার পাশের জানালাটা খুলে ফেলল বর্ষা। বৃষ্টির ছাট আসছে, তবু দেখল, আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, মুহুর্মুহু মেঘগর্জন আর মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। জানালা বন্ধ করে 'বৃষ্টি হচ্ছে' বলে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল বর্ষা।

মনে পড়ল, আজ তো রবিবার। স্কুল নেই। চোখে-মুখে জল দিয়ে বাবার ঘরে ছুটে এল বর্ষা। বাবাকে ঘরে না পেয়ে মায়ের কাছে ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়? মা বললেন, বাজারে গেছেন।

হাত-মুখ ধুতেই বাজার নিয়ে ফিরে এলেন বাবা। ভিজে একশা। ছাতায় কোনো কাজ হয়নি। এর মধ্যে বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ঝমঝম, শোঁ-শোঁ শব্দে কিছু শোনাই যাচ্ছে না। বাবা রান্নাঘরে ঢুকলেন। বর্ষা ছুটে গিয়ে দেখে, বাবা ইলিশমাছ এনেছেন। আনন্দে লাফিয়ে উঠল ও। ইলিশ যে তার প্রিয় মাছ। মা বললেন, আজ ছুটির দিন। কারও তাড়া নেই। আজ খিচুড়ি আর ইলিশভাজা হবে।

দুপুরে মায়ের খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজার গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করতে লাগল। বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। এত অন্ধকার যে সন্ধ্যেবেলা মনে হচ্ছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। এবার বৃষ্টি একটু থামল। বর্ষা জানালা দিয়ে দেখল মেঘ সরে যাচ্ছে। একঘণ্টা পর বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। কিন্তু রাস্তা জলে থই থই। একেবারে গরম নেই।

এবার বর্ষা স্কুলের 'বাড়ির কাজে' বর্ষণমুখর এই দিনটির কথা লেখার জন্য খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ল।

সপ্তর্ষি রায়, ষষ্ঠশ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮।

জাতীয় উদ্যান

মেরিন ন্যাশনাল পার্ক

ভারতের প্রথম সামুদ্রিক জাতীয় উদ্যান হলো গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে মেরিন ন্যাশনাল পার্ক। উদ্যানটি ৪২টিরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এটি ১০৮০ সালে একটি সামুদ্রিক অভয়ারণ্য এবং ১৯৮২ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত হয়। এই উদ্যানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাসা বাঁধে। এখামে বক, রেন, আইবিস, হাঁস, স্পুনবিল, গুল এবং ছোটো করমোটেন্ট দেখতে পাওয়া যায়। ডুগং, কচ্ছপ, স্পঞ্জ, চিংড়ি ও ইল প্রচুর রয়েছে। রয়েছে অসাধারণ প্রবাল প্রাচীর, ৩৭ রকমের শক্ত ও নরম প্রবাল, ৭০ প্রজাতির স্পঞ্জ, ২৭ রকমের চিংড়ি, ৩০ রকমের কাঁকড়া, ৯৪ প্রজাতির জলজ পাখি, ৭৮ প্রজাতির স্থলজ পাখি ১০৮ রকমের শৈবাল দেখা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৬

संख्यापाठः

८१–৮১ एकाशीतिः ।८२–৮২ द्व्यशीतिः ।

८३–৮৩ त्र्यशीतिः ।८४– ৮৪ चतुर्शीतिः ।

८५– ৮৫ पञ्चाशीतिः ।८६–৮৬ षडशीतिः ।

८७–৮৭ सप्ताशीतिः ।८८– ৮৮ अष्टाशीतिः

८९–৮৯नवशीतिः ।९०–৯০ नवतिः

९१–৯১एकनवतिः ।९२–৯২द्विनवतिः ।

९३–৯৩ त्रिनवतिः ।९४– ৯৪चतुर्नवतिः ।

९५–৯৫ पञ्चानवतिः । ९६–৯৬ षण्णनवतिः ।

९७–৯৭सप्तनवतिः ।९८–৫৮अष्टनवतिः

९९–৯৯ नवनवतिः ।१००–১০০ शतम् ।

ভালো কথা

নতুন অতিথি

গত বুধবার আমি একটি বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। শুক্রবার বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, জেঠুদের বাড়িতে একটি পায়রা পড়ে আছে। পায়রাটি আহত। জেঠিমা বললেন, ওটা কাল থেকে ওভাবেই পড়ে আছে। আমি আর ভাই পায়রাটিকে নিয়ে বাড়ি এলাম। তারপর একটু ধান আর জল খাওয়ালাম। গলার কাছে দেখি অনেকটা কেটে গেছে। ওখানে মলম লাগিয়ে দিলাম। বাবা পায়রাটিকে একটা ঝুড়িতে রেখে টাঙিয়ে দিলেন। আমি আর ভাই প্রতিদিন ধান আর জল খাওয়াই। আমরা কাছে গেলে পায়রাটি ভয় করে না। এখনো পায়রাটি উড়তে পারে না। উড়তে পারলেই ওকে ছেড়ে দেবো। দাদু বললেন, পায়রাটি আমাদের নতুন অতিথি।

শ্রেষ্ঠা দত্ত, নবমশ্রেণী, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

এসে গেল পূজা

শিউলি সেন, পঞ্চমশ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

পূজা আসতে নেইকো দেরি
প্যান্ডেল আধেক বাঁধা,
দুগ্গাঠাকুর একমাটি তো
গণেশের গায়ে কাদা।
মা সরস্বতী লক্ষ্মীঠাকরুন
কাত্তিকেরও তাই,
অসুরঠাকুর আর সিংহমামার
এখনো কাদা নাই।

ভাই বলছে, কবে হবে
এসে গেল পূজা,
তাড়াতাড়ি সারা না হলে
হবে না তো মজা।
মা বললে, হবে হবে
তাড়াতাড়ি হবে,
দেখতে দেখতে আসবে পূজা
শেষও হয়ে যাবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

২০২৬-২৭-এর ষোড়শ জনগণনা হতে চলেছে ভারতের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা

অর্ণব কুমার দে

বর্তমান কালে আইসল্যান্ডে ১৭০৩ সাল নাগাদ প্রথম পপুলেশন সেন্সাস বা জনগণনার ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনে ১৮৬৭ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত ভারতের নানা প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে জনগণনার কাজ চললেও ভারতে সরকারিভাবে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৮১ সালে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে সর্বশেষ জনগণনা হয় ২০১১ সালে। এটি ছিল পঞ্চদশতম জনগণনা। ২০১১ সালে ভারতের জনগণনা দু'টি ধাপে পরিচালিত হয়েছিল। দু'টি স্তরে হওয়া জনগণনায় ঘরবাড়ির তালিকা প্রস্তুত এবং জনসংখ্যা গণনা করা হয়। প্রথম পর্যায়ে জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (অর্থাৎ, ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার বা এনপিআর)-এর তথ্যও সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের জনসংখ্যা গণনার পর্বটি ২০১১ সালের ৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৭২ থেকে ভারতে জনগণনার কাজ শুরু হলেও ২০১১ সালের জনগণনায় প্রথমবার বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ওই বছরেই ৩১ মার্চ তারিখে প্রকাশিত একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১.২১ বিলিয়ন বা ১২১ কোটি। এরপরের সেন্সাস হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। এই মর্মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ আরজিআই (রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া) ২০১৯ সালের ২৬ মার্চ 'S.O.1455(E)'-শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে স্থগিত হয়ে যায় জনগণনার কাজ।

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে জনগণনার বিষয়ে বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্যরা দাবি তোলায় ভারত সরকার জনগণনায় তাতে অনুমোদন দেয়। ষোড়শ জনগণনার জন্য ২০২৬ ও ২০২৭ সালকে বেছে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৪৮ সালের 'দ্য সেন্সাস অ্যাক্ট'-এর ৩ নং ধারা অনুযায়ী ২০১৯ সালের বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে এই বছরের ১৬ জুন 'S.O.2681(E)'-শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া। পুরনো বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার বিষয়টি ২০০০ সালের 'দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) অ্যাক্ট'-এর ৮ নং ধারা অনুযায়ী 'CG-DL-E-16062025-263858'-শীর্ষক একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনে আরজিআই। এই নোটিফিকেশনে ১৬তম জনগণনার কথা উল্লেখিত হয়। ভারতে জনগণনার কাজ দশ বছর অন্তর হওয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ২০২১ সালে সেটি না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে যে, ২০২১ সালে ভারতের জাতীয় জনসংখ্যা গণনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও ২০২০ সালে কোভিড মহামারীর কারণে জনগণনার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। প্রায় ২ বছর ধরে এই মহামারীর প্রভাব থাকার কারণে জনগণনা স্থগিত করে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায় যে, ২০১৯ সালে দেশজুড়ে জনগণনার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেও, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত এই কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

এই বছর জুন মাসে প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশনে জনগণনার প্রক্রিয়াটি দু'টি পর্যায়ে হবে বলে জানানো হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে ১৬তম জনগণনার কাজের সূত্রপাত ঘটবে। এই দিন থেকে শুরু হবে জনগণনার প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে চলবে 'হাউজ লিস্টিং' বা বাড়ি গণনার কাজ। লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের দুর্গম, তুষারাচ্ছাদিত অঞ্চলে এই কাজ শুরু হবে। ৬ মাস ধরে চলবে এই ঘরবাড়ি গণনার কাজ। ২০২৭ সালের ১ মার্চ তারিখ থেকে শুরু হবে 'পপুলেশন ইনিউমারেশন' বা জনসংখ্যা গণনার কাজ। দু'টি কাজের ক্রমপর্যায়টি এইরকম যে, প্রথমে বাড়ি গণনা করা হবে এবং তারপর সেই বাড়িগুলিতে বসবাসকারী জনগণকে জনসংখ্যার তালিকায় নথিভুক্ত করা হবে। প্রথম ধাপ থেকে শুরু হওয়া কাজে প্রতিটি ভবন পরিদর্শন করে পরিবারের গঠন, ভবনের ধরন, ভবনটি নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রী, কক্ষ সংখ্যা, জল ও বিদ্যুতের উৎস, স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন) সুবিধা, জ্বালানি ব্যবহার এবং মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, যানবাহনের মতো সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তির নাম, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি/উপজাতি, ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতা থাকলে তার বিবরণ এবং অভিবাসনের ইতিহাসের মতো ব্যক্তিগত স্তরের তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হবে। গোটা দেশের গৃহহীন-সহ প্রতিটি ব্যক্তিকে এই ডেমোগ্রাফিক সার্ভে বা জনসংখ্যাগত সমীক্ষার আওতায় আনা হবে। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী ও তত্ত্বাবধায়ক এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার জন সেন্সাস স্টাফকে নিযুক্ত করা হবে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জনগণনার প্রাথমিক তথ্য কার্যক্রম সমাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ফলাফল (সেন্সাস রেজাল্ট) প্রকাশিত হবে।

১৬তম জনগণনার বিশেষত্ব হতে চলেছে 'কাস্ট ইনিউমারেশন' বা জাতিগণনা। জনগণের জাতিগত পরিচয়ের বিবরণ সংগ্রহের বিষয়টি এবারের জনগণনার অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। এছাড়াও থাকছে 'সেল্ফ ইনিউমারেশন' বা স্ব-গণনার সুযোগ। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কিত তথ্য নিজেই আপলোড করতে পারবেন। 'ডিজিটাল ডেটা কালেকশন' বা ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ হতে চলেছে ১৬তম জনগণনার অন্যতম অঙ্গ। জনগণনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে জানিয়েছে কেন্দ্র।

জনসংখ্যা গণনা সহজতর করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার : ২০২৬-২৭ সালের জনগণনা হতে চলেছে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনা। এই কাজের ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ), অনলাইন সেল্ফ ইনিউমারেশন (স্ব-গণনা) এবং রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণে সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হবে। গণনাকারীদের কাছে জনগণনা সফট্‌ওয়্যার-সহ স্মার্টফোন থাকবে এবং ভারতীয় পরিবারগুলিকে একটি ওয়েব পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে স্ব-গণনা করার অনুমতি দেওয়া হবে। স্ব-গণনার ভিত্তিতে একটি অনন্য আইডি তৈরি করা হবে, লোকজন তা

যাচাইয়ের জন্য গণনাকারীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবে।

পুরো জনগণনা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ‘স্ব-গণনা’ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি ডিজিটাল উদ্যোগ, যা বিভিন্ন ব্যক্তিকে একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন বা এনপিআরে নিজেদের নাম, পরিচয় ও নানা বিবরণ নথিভুক্ত করা এবং তাদের পরিবারের তথ্য অ্যাক্সেস, আপডেট ও যাচাই করার অনুমতি দেবে। এই প্রক্রিয়াটি ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনভাবে স্ব-গণনা সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি আরও বেশি সুবিধা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুল তথ্য আপলোড নিশ্চিত করবে। স্ব-গণনা প্রক্রিয়া শুরু করতে, একজন ভারতীয় নাগরিককে অনলাইনে ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসের অফিশিয়াল (সরকারি) পোর্টালে যেতে হবে। নিম্নোল্লেখিত পোর্টালটি খুলতে হবে— ‘https://se.npr.gov.in/npr/’। সেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর ইমেইল আইডি দিতে হবে, সেখানে উল্লেখিত ক্যাপচা কোডটি লিখতে হবে এবং ‘সাবমিট’-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর সেই ব্যক্তি বা পোর্টাল ব্যবহারকারীকে অনলাইনে বাকি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি দিতে হবে। নিজস্ব পরিচয় যাচাই করার জন্য তাঁর সামনে আসবে তিনটি লগ-ইন বিকল্প। তার মধ্যে তাঁকে একটিকে বেছে নিতে হবে।

বিকল্প ১ : মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বর— ড্রপডাউন মেনু থেকে ব্যক্তি যে রাজ্যের বাসিন্দা সেই রাজ্যটির নাম নির্বাচন করতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর এবং ১২-সংখ্যার আদার নম্বরটি লিখতে (বা টাইপ করতে) হবে। **বিকল্প ২ : নাম ও জন্ম তারিখ-সহ মোবাইল নম্বর**— ড্রপডাউন মেনু থেকে কোনো ব্যক্তি যে রাজ্যের বাসিন্দা সেই রাজ্যটিকে নির্বাচন করতে হবে। আধারের সঙ্গে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি লিখতে হবে। তাঁর পুরো নাম এবং জন্ম তারিখ প্রদান করতে হবে। **বিকল্প ৩ : পরিবারের প্রধান এবং অন্যান্য সদস্যদের তথ্য**— যিনি তাঁর বিষয়ে আপলোড করবেন, তাঁকে এখানে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে : রাজ্য, জেলা, তহশিল ও শহর; পরিবারের প্রধানের নাম ও জন্ম তারিখ; পরিবারের অন্য সদস্যের নাম, জন্ম তারিখ ও সম্পর্ক।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিনটি বিকল্পের মধ্যে কোনো একটি নির্বাচনের পর সেখানে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে ক্যাপচা কোড পূরণ করতে হবে। এরপর ঘোষণার (সেল্ফ ডিক্লারেশনের) চেকবক্সে টিক মার্ক দিতে হবে এবং পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে যাচাই (ভেরিফাই) ক্লিক করতে হবে। উপরের যেকোনো পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর পক্ষ থেকে আপলোড করা তথ্য সফলভাবে যাচাই হওয়ার পরে, পোর্টাল ব্যবহারকারীকে তাঁর অ্যাক্সেস প্রমাণীকরণের জন্য এবং স্ব-গণনা প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলি চালিয়ে যেতে ওটিপি (ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড) লিখে ভেরিফাই করতে হবে।

ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং তার মান নিয়ন্ত্রণ : গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ইন্টিগ্রেশন, জিওফেন্সিং এবং রিয়েল-টাইম ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের জনগণনা অ্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গণনাকারীরা ডেটাতে (তথ্যে) অসঙ্গতি (যেমন— অসম্ভব বয়স বা অবাস্তব পরিবারের আকার) সংশোধন করার জন্য স্বয়ংক্রিয় প্রম্পট পাবেন। আগে হাতে লেখা এন্ট্রিগুলি যেমন— জাতি, ভাষা, পেশা ইত্যাদিকে ড্রপডাউন-ভিত্তিক বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা যাবে। ‘ডিজিটাইজেশন’ পদ্ধতিটি মানুষের ত্রুটি এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের সময় কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং জনগণনা কমিশনার (আরজিআই)-এর কার্যালয় ইতিমধ্যেই জনগণনার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল কাঠামোটি তৈরি করেছে। গণনাকারীদের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, জিওট্যাগিং এবং ক্লাউড-ভিত্তিক ডেটা আপলোড সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একটি কেন্দ্রীভূত জনগণনা ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ সিএমএমএস-এ থাকবে রিয়েল-টাইম তত্ত্বাবধান, ডেটা ভেরিফিকেশন (তথ্য যাচাইকরণ) এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সুযোগ।

জনগণনার প্রশ্নাবলী এবং তথ্য সংগ্রহ : ভারতে ২০২৭ সালের জনগণনায় ঘরবাড়ি তালিকাভুক্তির পর্যায়ে একটি প্রশ্নাবলী থাকবে যা ৩৪টি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির বিষয় হলো : (১) ঘরে ইন্টারনেট সংযোগের সহজলভ্যতা, (২) মোবাইল ফোন ও স্মার্টফোনের মালিকানা, (৩) পানীয় জলের ধরন ও উৎস, (৪) রান্নার জ্বালানির ধরন (তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস/এলপিজি বা পাইপবাহিত গ্যাস সংযোগ), (৫) যানবাহনের মালিকানা, (৬) গৃহস্থালীর খাদ্যশস্যের ব্যবহার, (৭) ফলো-আপ বা অতিরিক্ত তথ্যাদি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর। জনগণনার বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ২৮টি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক-সূচক সংক্রান্ত প্রশ্ন। ১৬তম জনগণনায় উল্লেখযোগ্য কিছু সংযোজন হলো : (১) সকল সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণ ও জাতিগণনা, (২) জলবায়ু- সৃষ্ট স্থানচ্যুতি-সহ অভিবাসনের কারণ, (৩) ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্ন, (৪) ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরিত লিঙ্গের) ব্যক্তিদের জন্য স্পষ্ট শনাক্তকরণের ব্যবস্থা।

জনসংখ্যা গণনার গুরুত্ব : ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ‘জনগণনা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তপশিলি জাতি (এসসি) এবং তপশিলি উপজাতি (এসটি)-সহ বিভিন্ন সংরক্ষিত শ্রেণীর মানুষদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক সমাজের জন্য নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) এবং আসন সংরক্ষণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে জনগণনার দ্বারা সংগৃহীত তথ্য। রাজ্য ও জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় অনুদান, বিভিন্ন প্রকল্পে ভরতুকি দান এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বরাদ্দের জন্য জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য-সহ ভারত সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলি দেশজুড়ে স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রাস্তা নির্মাণের মতো পরিকাঠামো উন্নয়ন-বিষয়ক পরিকল্পনার জন্য জনগণনার তথ্য ব্যবহার করে থাকে। জনগণনার বিস্তারিত তথ্য অভিবাসন, কর্মসংস্থান, জমির উর্বরতা এবং নগরায়নের ধরন-সংক্রান্ত বিষয়েও আলোকপাত করে থাকে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসন, বিচারবিভাগের কাজে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক সেক্টর, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও জনগণনার তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় সংবিধানের ৮২ নং অনুচ্ছেদে সর্বশেষ জনগণনার উপর ভিত্তি করে সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা পুনর্নির্ধারণ (আসন পুনর্বিন্যাস)-এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, সংবিধানের ৩৩০ ও ৩৩২ নং অনুচ্ছেদে তাঁদের জনসংখ্যার অংশের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের বিধানও রয়েছে। প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের বাইরেও পারিবারিক কাঠামো, দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নিরন্তর গতিশীল সমাজের বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে তুলে ধরে ‘জনগণনা’। দেশীয় জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণনা আবশ্যক। □

হিন্দুসন্ন্যাসী সেজে ধর্মান্তরণের কারবার

মোটা টাকার টোপ দিয়ে হিন্দু মহিলা ধরত জামালউদ্দিন!

এতদিন লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করত জেহাদি যুবকরা। ক্রমেই সেটা পরিণত হয়েছে ব্যবসায়। এই কাজে বিধর্মীদের ধরে আনতে দালাল ছেড়ে রাখা হয়েছে বাজারে।

প্রণবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু মহিলা ধরে আনতে পারলেই মিলত লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার। তার আবার 'দর' ও ছিল আলাদা আলাদা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হলে এক রেট; মহিলা যদি ওবিসি সম্প্রদায়ের হন, তাহলে তাঁর দর কম। এভাবেই ধর্মান্তরের কারবার ফেঁদেছিল ছাঙ্গুরবাবা ওরফে জামালউদ্দিন। বিদেশি অর্থে ফুলেফেঁপে উঠেছিল ছাঙ্গুরবাবার 'বেওসা'। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে ছাঙ্গুরবাবা-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও সন্ত্রাসবাদ দমন স্কোয়াড।

জামালউদ্দিনের এই চক্রটি ১০০ কোটিরও বেশি বিদেশি অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতারণা ও প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু তরুণী কিংবা মহিলাদের ধর্মান্তরিত করা। ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে শান্তি, সম্প্রীতি এবং নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নকারীদের কোনো ঠাঁই নেই। ছাঙ্গুরবাবাকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে, যা অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা হয়ে থাকবে।'

উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের দাবি, এই কারবার করেই মধুপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছিল জামালউদ্দিন। সেই বাড়ি থেকেই অবৈধ ধর্মান্তরণের ব্যবসা শুরু করেছিল। লখনউ থেকে মুম্বই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই চক্রের জাল। জামালউদ্দিনের লোকজন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, টোপ দিয়ে, কখনো আবার ভয় দেখিয়ে হিন্দু নারীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করত। এজন্য লেন-দেন হতো বিপুল পরিমাণ টাকা। জামালউদ্দিনের ফাঁদে পড়ে কিছু মানুষ মুসলমান হওয়ার পর ফের হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। তার পরেই প্রকাশ্যে আসে এই চক্রের কথা। তদন্তে নামে এটিএস। এই

গ্যাঙের বাকিদের গ্রেপ্তার করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ধর্মান্তরণের এই চক্রের শেকড় বিস্তৃত আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিশেষ করে আরব আমিরশাহিতে। জামালউদ্দিনের প্রাসাদোপম বাংলোয় তার সঙ্গে থাকত নিতু রোহরা, নবীন রোহরা ও তার মেয়ে। এই তিনজনকেই জামালউদ্দিন মুসলমান হতে বাধ্য করেছিল। বাড়িটিতে থাকাত জামালউদ্দিনের ছেলে মেহবুবও। পুলিশ-প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে বাড়িটি সে করে ছিল নিতু ও নবীনের নামে। চারজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ এই পাঁচ বছরে নিতু আরব আমিরশাহিতে গিয়েছিল ১৯ বার। এটিএস জেনেছে, নিতু তার স্বামী নবীন রোহরা এবং তাদের মেয়ে ২০১৫ সালে দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুসলমান হওয়ার সার্টিফিকেট নিয়েছিল। যদিও তাদের পাসপোর্টের রেকর্ডে দুবাই সফরের যে তারিখের উল্লেখ রয়েছে, তা নিয়ে অসঙ্গতি রয়েছে।

মাত্র পাঁচ বছরে এতবার নিতু কেন আরব আমিরশাহিতে গিয়েছিল, বিদেশি অর্থায়নের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, তা খতিয়ে দেখছে এটিএস। জামালউদ্দিনের অপারেশন ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। সে একাধিক ভুয়ো ট্রাস্ট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এর মধ্যে ছিল 'আস্বি এন্টারপ্রাইজেস, আস্বি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, আসিপিয়া হাসনি হুসেইনি কালেকশন এবং বাবা তাজউদ্দিন আস্বি বুটিক। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত বিদেশ থেকে আসা কালো টাকাকে সাদা করার জন্য ব্যবহৃত হতো। ধর্মান্তরণের উদ্দেশেই এই অর্থ আসত বিদেশ থেকে।

এসব ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আটটি বাংক অ্যাকাউন্টেরও হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা দেখেন, জামালউদ্দিন ৬ লক্ষ টাকা একটি বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে। এনইএফটির মাধ্যমে স্থানান্তর করেছিল ১০ লক্ষ টাকাও। এছাড়াও তার সহযোগীদের সঙ্গে আরও অনেক সন্দেহজনক লেন-দেনের প্রমাণ মিলেছে। জামালউদ্দিনের এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিল পুনের ইদুল ইসলাম। সে এই নেটওয়ার্ক বিস্তারে সাহায্য করত। জামালউদ্দিন অন্যান্য রাজ্যেও জমি ও সম্পত্তি কিনে অপারেশনাল বেস গড়ে তুলেছিল।

এসটিএফ জানিয়েছে, জামালউদ্দিনের পুনেতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে, লোনাভালায় তার এক সহযোগী মহম্মদ আহমেদ খানের নামে ১৬ কোটি টাকার একটি সম্পত্তিও কিনছে সে। এই ধর্মান্তর চক্রে জড়িত মুসলমান পুরুষদের টাকাও দেওয়া হতো। কোনো হিন্দু মহিলাকে প্রলুব্ধ করে ধর্মান্তর করলেই জুটত মোটা অঙ্কের পুরস্কার। যে মহিলাদের ধর্মান্তরণ করা হতো, তাঁদের জাত অনুসারে ঠিক হতো টাকার অঙ্ক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শিখ নারীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারলেই মিলত ১৫-১৬ লক্ষ টাকা। মহিলা যদি ওবিসি সম্প্রদায়ের হন, তাহলে পুরস্কার বাবদ মিলত ১০-১২ লক্ষ টাকা। অন্যান্য জাতের মহিলাদের ধর্মান্তর করতে পারলে মিলত আরও কম টাকা। এর পরিমাণ ৮-১০ লক্ষ টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করত। তদন্তকারীরা জেনেছেন, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন করতেই শুরু হয়েছিল এই ব্যবসা। প্রসঙ্গত, এই মডেলটি অনেকটা বেওয়ার মুসলিম গ্যাং কেসের মতো। সেখানে হিন্দু স্কুলছাত্রীদের টার্গেট করে শোষণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের জন্য একইরকম পন্থা অবলম্বন করা হতো।

জামালউদ্দিন রেহরা মাফি গ্রামের বাসিন্দা। সস্তার আংটি ফেরিওয়ালা ছিল সে। ২০২৫ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে গ্রামপ্রধান হয়। তারপর থেকেই দ্রুত ঘুরতে থাকে তার ভাগ্যের চাকা। রাজনীতিতে 'মধু'র স্বাদ পেয়ে ছেলে মেহবুবকেও রাজনীতিতে নিয়ে আসে জামালউদ্দিন। যদিও তার পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল টাকা খরচ করেও আর জিততে পারেনি জামালউদ্দিন।

রাজনীতির এই 'কারবারে'র পাশাপাশি জামালউদ্দিন বিছোতে থাকে ধর্মান্তর চক্রের জালও। এজন্য কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থও আসতে থাকে বিদেশ থেকে। রাতারাতি বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় জামালউদ্দিন। বিভিন্ন জায়গায় নামে-বেনামে সে একাধিক সম্পত্তি কেনে, নির্মাণ করে শোরুম, বানায় বিলাসবহুল বাড়ি, কেনে দামি দামি গাড়িও।

২০২১ সালে বেআইনি ধর্মান্তর নিষিদ্ধকরণ আইন করে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। তার পরেও ছলে-বলে-কৌশলে চলছে ধর্মান্তরের কাজ। ইসলামে 'তাকিয়া'র (ধর্মের জন্য প্রতারণা) কোনো সীমা নেই। এই তো গত বছরের কথা। সেবার আবদুর রহমান নামে এক চিকিৎসক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এক হিন্দু সহকর্মীকে বিয়ে করার লোভে। মহিলার নাম হর্ষ সারঙ্গি। বিয়ের পরেই মুখোশ খুলে ফেলেন ওই চিকিৎসক। নিজে তো বটেই হর্ষকেও তিনি ধর্মান্তরিত করেন ইসলামে। ওই দম্পতির একটি ছেলেও রয়েছে। আবদুর তাকেও নমাজ আদায় করতে শেখাতেন। খাওয়াতেন গোরুর মাংসও। হর্ষ এসবে আপত্তি করলে জুটত অকথ্য নির্যাতন। আবদুরের মুখোশ খুলে পড়তেই তা জানতে পারেন হর্ষের পরিবার। তাঁরা পুরো ঘটনাটি থানায় জানান। তার পরেই গ্রেপ্তার করা হয় আবদুরকে। সেটাও ছিল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ঘটনা। এতদিন লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করত জেহাদি যুবকরা। ক্রমেই সেটা পরিণত হয়েছে ব্যবসায়। জামালউদ্দিনের মতো কিছু লোক বিধর্মীদের ধরে আনতে দালাল ছেড়ে রেখেছে বাজারে। তারাই কখনো ভালোবাসার অভিনয় করে, কখনো আবার ভয় দেখিয়ে ধরে নিয়ে আসে 'শিকার'। পয়সা নিয়ে কেটে পড়ে দালাল। রাতারাতি হিন্দু থেকে মুসলমান হতে বাধ্য হন মহিলারা। দ্রুত বদলে যায় এলাকার জনবিন্যাসের চিত্র।

এদিকে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি তাঁর রাজ্যে ভুয়ো সন্ন্যাসী চিহ্নিত করতে 'অপারেশন কালনেমি' চালু করেছেন। কুমায়ুন বিভাগের ছ'টি জেলায় পুলিশ ৩০০-রও বেশি ভুয়ো সাধুকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তরাখণ্ডের ইনসপেক্টর জেনারেল নীলেশ আনন্দ বার্নে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে পুলিশ ১২৫০ জন সন্দেহ ভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। □

প্রতি গ্রামে সঙ্ঘ, প্রতি ঘরে সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৪-৬ জুলাই নতুন দিল্লির ঝাণ্ডেওয়ালাস্থিত কেশবকুঞ্জে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক সম্পন্ন হয়। ৭ জুলাই অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত এবং সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলের পথনির্দেশ সমস্ত কার্যকর্তা প্রাপ্ত হন। বৈঠকে সারা দেশ থেকে মোট ২৩৩ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত ৩২টি সংগঠনের সংগঠন সম্পাদক অংশগ্রহণ করেন। সকলেই নিজ নিজ কাজ এবং সমন্বয়ের কৌশল বর্ণনা করেন।

শ্রীআম্বেকর বলেন, বৈঠকে শতাব্দী বর্ষ সমারোহের পরিকল্পনায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও চর্চা-আলোচনা হয়। সমস্ত প্রান্তে, বিভাগে ও জেলায় স্বয়ংসেবকদের কাজের আলোচনাও হয়। প্রচারক ও কার্যকর্তারা জানান, কীভাবে সঙ্ঘের কাজের বিস্তার ঘটছে এবং বিভিন্ন বিভাগ তাদের সম্পর্কিত কাজকে কীভাবে দৃঢ় করছে। স্থানীয় অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ সমস্যা এবং তার সমাধানের উপর বিশেষ আলোচনা হয়। সঙ্ঘকার্য তৃণমূল স্তরে কতটা প্রভাবী হচ্ছে তার গভীর সমীক্ষাও বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

শ্রীআম্বেকর জানান, শতাব্দী বর্ষে সমাজের সকল শ্রেণীর সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষেত্রে মণ্ডল এবং নগরীয় ক্ষেত্রে বসতি স্তর পর্যন্ত হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। বর্তমানে দেশের সাংগঠনিক পরিকাঠামোয় ৫৮,৯৬৪টি মণ্ডল এবং ৪,৪৫৫টি বসতি রয়েছে। হিন্দু সম্মেলনে সমাজের উৎসব, সামাজিক একতা ও সদ্ভাব এবং পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এভাবেই সমাজে সদ্ভাব-সমরসতা বৃদ্ধি করতে ১১,৩৬০টি খণ্ড-নগরে সামাজিক সদ্ভাব বৈঠকের আয়োজন করা হবে। সাংগঠনিক পরিকাঠামো অনুসারে দেশের ৯২৪ জেলায় প্রমুখ নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। গোষ্ঠী, পেশা ও বর্গ অনুসারে সম্মেলনে ভারতীয় ভাবনা, ভারতের গৌরব, ভারতের 'স্ব' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হবে।

তিনি বলেন, বড়ো গৃহ সম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক বসতির সর্বাধিক বাড়িতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। শতাব্দী বর্ষের সমস্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বিস্তৃত সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে ভৌগোলিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে সমাজের সমস্ত লোকের কাছে পৌঁছানো এবং সমস্ত কাজে তাদের অংশগ্রহণ হয়। এই

অভিযান এক প্রকার সর্বসমাবেশী, সর্বস্পর্শী হবে। বিজয়াদশমী উৎসব থেকে শতাব্দী বর্ষের শুভারম্ভ হবে। সারা দেশে আয়োজিত বিজয়াদশমী উৎসবে সমস্ত স্বয়ংসেবক সম্মিলিত হবেন।

শ্রীআম্বেকর বলেন, দেশ প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি করছে, কিন্তু এতটুকুই পর্যাপ্ত নয়। আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের নিজস্ব বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গেও সমাজের সমস্ত মানুষের চিন্তা করা, পরিবেশের চিন্তা করা, পারিবারিক জীবনমূল্য রক্ষা করা, সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখা, পঞ্চ পরিবর্তনের এই বিষয়কে আমরা সমাজের কাছে নিয়ে যাব। এ বিষয়ে সমাজ যদি চিন্তা করে এবং সমাজ সহভাগী হয় তবে আমাদের এই প্রগতি একপক্ষীয় না হয়ে বরং সর্বসমাবেশী হবে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবে।

বৈঠকে মণিপুরের বর্তমান স্থিতি, স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত কাজ এবং সামাজিক সদ্ভাবের উদ্দেশ্যে নানান প্রয়াসের বিষয়েও আলোচনা হয়। মণিপুরে স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টার ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বয়ংসেবকরা উভয় পক্ষের সঙ্গেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। সীমান্তবর্তী প্রান্ত থেকে আসা কার্যকর্তারা সেখানকার কাজের অবস্থা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সঙ্ঘের কার্যকর্তারা সমাজের সঙ্গে একযোগে স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করতে, তাদের সমস্যা সমাধান করতে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সারা দেশে ১০০টি প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। ৪০ বছরের কম আয়ুর স্বয়ংসেবকদের নিয়ে আয়োজিত ৭৫টি বর্গে ১৭,৬০৯ জন স্বয়ংসেবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একইভাবে ৪০-৬০ বছর বয়সের জন্য আয়োজিত ২৫টি বর্গে ৪,২৭০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে এই সব প্রশিক্ষণ বর্গে সারা দেশে ৮,৮১২ স্থান থেকে স্বয়ংসেবকরা অংশগ্রহণ করেন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীআম্বেকর বলেন, লোভ দেখিয়ে, জোরপূর্বক বা অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অথবা ষড়যন্ত্র করে ধর্মান্তর করা অন্যায়। অন্যএকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতের সমস্ত ভাষাই রাষ্ট্রভাষা এবং সঙ্ঘ মনে করে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

তিন দিবসীয় বৈঠকে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়েও কি আলোচনা হয়েছে?— এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীআম্বেকর বলেন, দেশজুড়ে ঘটে চলা ঘটনার সমীক্ষা এবং তা নিয়ে চিন্তন-মন্থন করা হয়। কংগ্রেসের একটি মন্তব্য 'যদি তারা ক্ষমতায় আসে তবে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কংগ্রেস আগেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, যা আদালতের হস্তক্ষেপে অপসারণ করা হয়, কেননা সেটা অবৈধ ছিল। তিনি বলেন, মাওবাদী ঘটনাও অনেকাংশে কমেছে। এসব জনগণের প্রতিরোধ এবং প্রভাবী সরকারি প্রচেষ্টার কারণেই হয়েছে। হিংসা সমাপ্ত হওয়া উচিত এবং সৃজনশীলতার পথ গ্রহণ করা উচিত। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতমাতার ধারণা সঙ্ঘের নয়, বরং আমাদের সভ্যতা ও পরম্পরার অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মাতৃভূমিকে এক দিব্য মাতৃ রূপে দেখেন, এমন একটি চিত্র যাকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা দেওয়া উচিত। এই মূল্যবোধকে গৃহ সম্পর্ক অভিযানের সময় সক্রিয়ভাবে পৌঁছানো হবে। তিনি বলেন, এই বছর সঙ্ঘ বিজয়াদশমী উৎসব সারা দেশে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালন করবে, যাতে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বর্গের স্বয়ংসেবকদের অংশগ্রহণ হবে।

এই সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লির প্রান্ত সঙ্ঘচালক ডাঃ অনিল আগরওয়াল, অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ দ্বয় নরেন্দ্র ঠাকুর এবং প্রদীপ জোশী উপস্থিত ছিলেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুভাষচন্দ্র তরফদার গত ১৮ জুলাই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী এবং একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন। সুভাষদা পেশায় শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের জেলা ও বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ ও ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ২০১২ সাল থেকে তিনি বসিরহাট জেলা ক্রীড়া ভারতীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতার আরএন টেগর নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাঙ্গালি আবেগের আড়ালে অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও আন্দোলন

বিপ্লব বিকাশ

থ্রি ইডিয়টস ছবিতে পরীক্ষার সময় তিন প্রধান চরিত্র সময়মতো তাদের উত্তরপত্র জমা দিতে পারে না। শিক্ষক তাদের উত্তরপত্র জমা নিতে অস্বীকার করেন। তখন প্রধান চরিত্র শিক্ষককে প্রশ্ন করে, স্যার, আপনি জানেন আমরা কারা? আমাদের নাম কী? আমাদের রোল নম্বর কত? শিক্ষক 'না' বলতেই সে নিজের ও বন্ধুদের উত্তরপত্র নিয়ে বাকি উত্তরপত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। শিক্ষক বুঝতে পারেন না কোনটা আগে জমা পড়েছে আর কোনটা পরে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতেও যেন সেই একই মডেল দেখা যায়। এখন সেই একই মডেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবলম্বন করছেন অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে।

গত ১৬ জুলাই প্রবল বর্ষার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার রাস্তায় যে 'বাংলার অস্মিতা' রক্ষার নামে পদযাত্রা করলেন, তা আদতে বঙ্গসংস্কৃতি ও অস্মিতাকে রক্ষা করার কোনো প্রচেষ্টা নয়, বরং একে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করার একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। এই পদযাত্রা এমন এক সময়ে করা হয়েছে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করে আটক ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়াকে 'বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে সারা দেশের বাঙ্গালি সমাজকে আবেগের ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই উক্তি— ' বাংলা বলা যদি অপরাধ হয়, তবে আমাকে গ্রেপ্তার করুন', এটি কেবল একটি রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, বরং এটি একরকম দেশবিরোধী শক্তিগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণাও বটে। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কেবলমাত্র বাংলাভাষায় কথা বললেই কেউ ভারতীয় নাগরিক হয়ে যায় না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে আসা লক্ষ লক্ষ মুসলমানও বাংলায় কথা বলেন। তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন তাদের সবাইকে 'বাংলা অস্মিতা'-র অংশ হিসেবে ভারতীয় করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন?

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়েছে, তা আর গোপন নেই। বর্তমানে যখন বহু রাজ্যে তাদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরো বিষয়টিকে 'বাঙ্গালিদের সম্মানের প্রশ্ন' বানিয়ে তাদের রক্ষা করতে নেমে পড়েছেন। এ যেন ঠিক সেই শিক্ষক নিয়োগের মতো, ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া আর সৎভাবে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পাওয়াদের এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলে দেওয়া। শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে যেমন নির্দিষ্ট ছিল না, কে বৈধ আর কে অবৈধ। তেমনই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাভাষী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গাদেরও ভারতীয় নাগরিক করতে চাইছেন।

এই পদযাত্রা আসলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার একটা কৌশল। যখন রাজ্যে বেকারত্ব চরমে, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে— তখন সেসব বিষয়ে মুখ না খুলে তিনি বিভাজনের রাজনীতি করছেন। এই পদযাত্রা না তো বাঙ্গালিদের স্বার্থে আর না তাঁদের আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য। এটি ছিল স্পষ্টভাবে 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন', যার আড়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের ভোটব্যাংক মজবুত করতে চাইছেন।

তিনি জানেন যে, তাঁর মুসলমান ভোটারদের বড়ো একটি অংশ বাংলাদেশি। যদি তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়, তবে তাঁর রাজনৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়বে। তাই তিনি এই লড়াইকে ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে মুসলমান ভোটারদের উসকে দিতে চাইছেন এবং হিন্দু বাঙ্গালিদের নামে আবেগতাড়িত করতে চাইছেন। কিন্তু এখন রাজ্যের সচেতন নাগরিকেরা তাঁর এই ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছেন। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুক পেজে এই সম্পর্কিত পোস্টের কমেন্ট বক্সে জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখেই পরিষ্কার হওয়া যাচ্ছে।

এখন সময় এসেছে, যখন সারা দেশের হিন্দু বাঙ্গালি— তাঁরা দিল্লিতে থাকুন বা মহারাষ্ট্রে, অসমে বা ছত্তিশগড়ে, এই সর্বনাশা রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চারে মুখ খুলতে হবে। বাংলা বলা অবশ্যই গর্বের, কিন্তু কেবল ভাষার ভিত্তিতেই কাউকে ভারতীয় বানিয়ে নেওয়া পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক।

আসলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদযাত্রা ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি, নারী সুরক্ষায় ব্যর্থতা এবং জনবিরোধী নীতিগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর একটি কৌশল। এটি মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি প্রচেষ্টা, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব শুধু বঙ্গালিদেরই।

সময় এসেছে যখন দেশের প্রতিটি প্রকৃত ভারতীয় বাঙ্গালি, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম্যক এই বিভাজনমুখী ভোটব্যাংক নির্ভর রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে বঙ্গের অস্মিতা মানে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহ্য রক্ষা। রাজনীতির নামে অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি বা দুধেলগাইদের তোষণ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সেই বঙ্গীয় অস্মিতায় নিহিত, যা দেশপ্রেমে বিশ্বাস করে,অগ্রগতির পথকে গ্রহণ করে এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ মনে করে। সেই রাজনীতি নয় যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা-নেত্রীদের হাত শক্ত করে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩২)

জেল যাত্রা

‘এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ’ গান্ধীজীর এই ঘোষণায় জনমানসে একটা জোয়ার এনে দিল— অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই। ডাক্তারজী তখন মধ্যপ্রান্তের গ্রামে ও শহরে ভ্রমণ করে জনজাগরণের সভা সমিতিতে ভাষণ দিতে লাগলেন। ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরের সঙ্গে বোম্বে এবং তার আশে পাশের অঞ্চলে ওজস্বী ভাষণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করতে সমর্থ হন। ডাক্তারজী যখন ভাষণ দিতেন তখন তা শুধু সাদামাটা দেশভক্তির ভাষণ হতো না, কথাগুলো হতো যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তাতে মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত হতো। তাঁর ভাষণ সম্পর্কে দাদারাও পরামার্থ বলেছেন— ‘ইংরেজ তথা ইংরেজ রাজত্বের আলোচনা শুরু হওয়ার পর ডাক্তারজীর ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকতো না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভাবাবেগে তার শরীর কম্পিত হতে থাকতো। রক্তবর্ণ চক্ষু, মুষ্টিবদ্ধ হাত, বাহু যুগল স্ফুরিত— এইরকম রুদ্রমূর্তি সেই সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ত।

সংবাদপত্রে এই জ্বালাময়ী ভাষণের কথা ছাপা হতে থাকলো। প্রবলভাবে তা নাড়া দিত জনমানসকে। ডাক্তারজীর এইসব ভাষণ ইংরেজ সরকারের পছন্দ হলো না। সরকার তার ভাষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ১৯২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ দেওয়া হলো— পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ যা জনসভা বলে গণ্য হবে। তেমন জায়গায় ডাক্তারজীর কোনো বক্তব্য রাখা হবে আইন বিরুদ্ধ। ইংরেজ তো জানতো না ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। যথারীতি তাঁর ভাষণ সর্বত্র চলতে থাকলো। ফলস্বরূপ তাঁর উপরে সরকার রাজদ্রোহের অভিযোগ আনলো। ৩১ মে বিচারপতি স্মেলির আদালতে মামলা শুরু হলো। তাঁর ভাষণের ভিত্তিতে আদালতে তার উকিলকে বিচারপতি স্মেলি সাহেব বারবার বাধা দিলে তিনি বিচারকক্ষ ত্যাগ করেন। এরপরে ডাক্তারজী নিজ পক্ষের সওয়ালে জবাব নিজেই করেন। সেখানে সরকারি সাক্ষী তার সওয়ালের সামনে খুব একটা দাঁড়াতে পারেনি। কোর্ট ডাক্তারজীকে লিখিত উত্তর দিতে বলেন।

তাঁর লেখা উত্তর পড়ে বিচারপতি স্মেলি বলেন, ওঁর মূল ভাষণ অপেক্ষা এই প্রতিবাদ মূলক বক্তব্য আরও বেশি রাজদ্রোহপূর্ণ (this statement is more seditious than his speech)। লিখিত বর্ণনার সঙ্গে ডাক্তারজী আদালতে যে বক্তব্য রাখেন তা ছিল আরও উত্তেজক। ১৯ আগস্ট ডাক্তারজীর উপরে ১০৮ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী জামিনের মামলার রায় দেওয়ার সময় মি. স্মেলি শর্ত প্রদান করেন যে— তিনি এক বছর পর্যন্ত এরূপ রাজদ্রোহপূর্ণ ভাষণ দিতে পারবেন না। এরূপ প্রতিশ্রুতি লিখে এক হাজার টাকার দুটি জামিন এবং এক হাজার টাকার ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে নগদ মুচলেকা দিতে হবে। রায় শোনার পরে ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে ডাক্তারজী বলেন— ‘আমি কোনো অপরাধ করিনি, সরকারের দুষ্ট দমন নীতি জ্বলন্ত আগুনে তেলের কাজ করেছে। বিদেশি রাজসত্তা শীঘ্রই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আপনি যা খুশি রায় দিতে পারবেন। আমি এই জামিনের শর্ত স্বীকার করি না।’ ডাক্তারজীর বক্তব্য শেষ হতে না হতে মি. স্মেলি তাঁকে এক বছর সংশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আদালত জুড়ে নানা সহযোগী জনতার ভিড়। প্রকৃত দেশের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে নাতিদীর্ঘ ভাষণে কিছু কথা বলে দুই হাত জড়ো করে সকলকে নমস্কার জানিয়ে তিনি টাঙায় উঠলেন। পুলিশের নিয়ন্ত্রিত টাঙা জেলের উদ্দেশে চলতে শুরু করল, ততক্ষণে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে জনতার ঘোষণা নিনাদিত হলো— ‘ডাঃ হেডগেওয়ারজীর জয়’।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস